সত্যজিতের ছবি ও খেরোর খাতা

সুনীত সেনগুপ্ত



গাঙচিল

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
শ্রীমন্ত করণ ৩৮ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া ৭১১ ১০৪

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ১৯১/১, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট
হিরণ মিত্র

মা ও বাবা-কে

সূচি

বাগানবাড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাহিনিটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ভাবা হয়েছিল একটি বাগানবাড়িকে কেন্দ্র করে। ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরোনো আমলের প্রাসাদোপম বাড়ি। বিষয় প্রায় একই রকম। একটি পরিবার জড়ো হয়েছে এই বাগানবাড়িতে। উদ্দেশ্য, একটা গোটা দিন কাটাবে পিকনিকের মেজাজে। সারা দিনের ঘোষিত কর্মসূচিতে আছে খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব, তাস খেলা, মাছ ধরা আর হইহল্লোড় করা। তবে এর পেছনে একটা hidden agenda-ও আছে। আর সে জন্য আমন্ত্রিত পরিবার-বহির্ভূত একজন যুবক। যার সঙ্গে পরিবারের কর্তার আগ্রহ তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার। তাই প্রাথমিক আলাপের পর বিয়ের প্রস্তাব— সম্ভব হলে আজই পাকাপাকি করা। এ পরিবারে সব কিছু চলে কর্তার ইচ্ছেয়। তাই তিনি নিশ্চিন্ত, আজও সব কিছু তাঁর পরিকল্পনামাফিক চলবে।

বাগানবাড়ির লোকেশন দেখাও হয়েছিল, কলকাতা থেকে একটু দূরে বালি ব্রিজের পাশে, গঙ্গার ধারে ঠাকুর পরিবারের এক সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন ঠাকুরের বাগান-ঘেরা একটি প্রাসাদোপম বাড়ি। বাড়িটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। থাম, খিলান, structural design, জানলা, দরজা একটা যুগকে প্রতিফলিত করে। এই বাড়ির ঘর, আসবাবপত্র, ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখে তার ইতিহাস উন্মোচন করবে মনীষা ও প্রণবেশ। কাঞ্চনজঙ্ঘার পক্ষিপ্রেমিক মামা এই কাহিনিতে মাছ ধরতে বসবে ছিপ নিয়ে। ছিপে গাঁথার চেষ্টা— যদি একটা দাঁও মেলে। ঘোড়ায় চড়ার বদলে

বাচ্চা মেয়েটি, টুকলু খেলা করবে প্লাস্টিকে তৈরি একটা খেলনা হেলিকপ্টার নিয়ে। যেটা এক জায়গা থেকে উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় পড়বে। সেই সূত্র ধরে দৃশ্যান্তরে চলে যাবে কাহিনির বিষয়ও। বাগানবাড়িতে সবাই জড়ো হবে মোটরগাড়িতে। পাঁচটি ভাগে। গাড়ির কোনওটা আমেরিকান, কোনওটা বিলিতি। কোনওটা শোফার-চালিত, কোনওটা ড্রাইভার-বাহিত, আর কোনওটা গাড়ির মালিক নিজেই চালান। এই খুঁটিনাটি তারতম্যে চরিত্রগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিষ্কার হবে। সত্যজিৎ রায় তাঁর চরিত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেন সঠিক পরিবেশ নির্বাচন করে, যে পরিবেশে বা যে অবস্থায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে দোষ বা গুণ সবচেয়ে ভাল প্রস্ফুটিত হয়, বা তাদের চালচলনের ডিটেলসে (হাবভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটাচলা, ব্যবহার) আর কথোপকথনের (বলার ভঙ্গি উচ্চারণ, ভাষা) মধ্য দিয়ে। আবার কোনও কোনও সময়ে একটি পার্শ্বচরিত্রের প্রতিঘাতে, যেমন *চারুলতা* ছবিতে মন্দাকিনীর পাশে চারু।

অশোক এই কাহিনিতে অনিলের বন্ধু। কলকাতার বাড়িতে সেই দিন হঠাৎ চলে আসা এই বন্ধুটিকে অনিল প্রায় জোর করে রাজি করিয়ে নিয়ে এসেছে, এই পিকনিকে। প্রাথমিক পরিকল্পনায় চরিত্রসংখ্যা ছিল একটু বেশি। মোট ১২ জন। মনীষার একটি বন্ধু ছিল আর বড় মেয়ে অণিমার মেয়ে ছাড়াও একটি ছেলেও ছিল। কাহিনিতে এদের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকাও ছিল। পরবর্তীকালে ছবির বা কাহিনির প্রেক্ষাপট পাল্টে যাওয়ায় এই চরিত্র দুটিকে বাদ দেওয়া হয়।

বাগানবাড়ি ছবি তৈরির পরিকল্পনার কাজ অনেক দূর গড়িয়েছিল। লোকেশন দেখা ছাড়াও চিত্রনাট্যের একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি হয়েছিল। টুকিটাকি সরঞ্জাম, সিনেমার ভাষায় যাকে বলা হয় *প্রপ্স*, তারও একটা ফর্দ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এই বাড়িতে শুটিং করার জন্য বাড়ির মালিকের অনুমোদন মিলল না, তখনই প্রেক্ষাপট পাল্টে দার্জিলিঙের কথা ভাবা হয়। হাতের কাছে দার্জিলিং সত্যজিৎ রায়ের খুব প্রিয় শহর। মা-র সঙ্গে ছোটবেলায় অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এই শহরে। বাবা সুকুমার রায়ও ১৯১২ সালে লেখা একটি চিঠিতে Bournemouth-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এই শহরকে। ছবি পরিচালনার কাজ পেশাগতভাবে শুরু করার পর সত্যজিৎ রায় প্রথম দিকে ছুটি কাটাতে বা নিরিবিলিতে চিত্রনাট্য লেখার কাজেও দার্জিলিঙে আসতেন। এ ছবির চিত্রনাট্যও দার্জিলিঙে বসে লেখা। দার্জিলিং-এর ম্যালটাকে তাঁর বরাবরই ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে। এখানে এসে রঙের কথাও মাথায় এসে যায়। *বাগানবাড়ি* গল্পটার মেজাজ ছিল ল্যাকোনিক, স্যাটেরিক্যাল। লোকেশন বদলে যাওয়ার জন্য ছবির বিষয় ও নাটকীয়তাও সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি বুঝতে

পারছিলেন বিষয়বস্তু তাঁর ভাবনায় যে রকম আকার নিচ্ছে, সেটা আরও সংহত রূপ নেবে দার্জিলিঙের মতো একটা পরিবেশে। এই শৈলনগরীর আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যে পরিবেশের মুড পরিবর্তন, শৈলশিখর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তা, পাহাড়ি রাস্তাঘাটের নানান রহস্য ছবির বিষয়বস্তুর মেজাজের সঙ্গে একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করবে। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভের সুবাদে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও তার প্রভাবের গুরুত্বকে। পরিবেশ মানুষের মনে যে অনুভূতির সঞ্চার করে তার যথার্থ রূপায়ণে চরিত্রকে আরও স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত করে তোলা যায়। প্রকৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক, এর প্রতি ঔদাসীন্য চরিত্রের একটা বিশেষ দিক বা অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলে। তাই কাহিনিকে কোনও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার আগে সেই জায়গার প্রকৃতি ও বিশেষত্বগুলিকে নজরে আনা প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে তাঁরই ডায়রির পাতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, তাঁর কাজের বিশেষ পদ্ধতিকে জানার জন্য। উদ্ধৃতিটি *অপরাজিত* ছবি তৈরির সময় বেনারসের ঘাটের পরিবেশ সম্পর্কে লেখা।

'ভোর পাঁচটায় ঘাটগুলো ঘুরে দেখতে বেরোনো গেল। সূর্য উঠতে আধঘণ্টা, এখুনি এতটা আলো, এতটা কর্মব্যস্ততা আশা করিনি। শোনা গেল স্নানার্থীরা আসতে শুরু করে সেই রাত চারটে থেকে। পায়রাগুলো এখনো বেরোয়নি, কিন্তু পালোয়ানরা ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। অপরূপ এই পরিবেশের কোনো তুলনা হয় না। ইচ্ছে করে এর প্রভাব মনের মধ্যে আরো সঞ্চয় করি, তা পবিত্র করবে, সঞ্জীবিত করবে।... এই অতুলনীয় দৃশ্যই মনে প্রেরণা এনে দেবার মতো যথেষ্ট। আশ্চর্য, অতুলনীয়, বিস্ময়কর বললে অবশ্য ঘাটগুলির কোনো বর্ণনাই হয় না। কেন অতুলনীয়, মনের মধ্যে কেন তার প্রভাব— তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তার ফলে অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে, স্থির করা যাবে ছবিতে এর কতটা ধরাতে, কতটা ছাঁটতে হবে।

একই ঘাটের চেহারা বিকেলে সম্পূর্ণ আর এক রকম। লালচে রঙের চওড়া-চওড়া ঘাটের সিঁড়িতে স্থানে স্থানে সাদার ছোপ পড়েছে— দলে দলে বিধবা মহিলারা বসে আছেন নিশ্চল হয়ে। স্নানার্থীর ব্যস্ততা নেই। আলোর চেহারা একেবারে পালটে গেছে, সেটা খুব লক্ষ্য করবার মতো। ঘাটগুলো পূর্বমুখী। সকালে ঠিক সামনে থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ে। ঘাটের উপর ছায়ার চাঞ্চল্য থেকে কর্মব্যস্ততা আরো বেশি স্পষ্ট হয়। আবার চারটে নাগাদ সূর্য এদিককার উঁচু-উঁচু দালানকোঠার আড়ালে চলে যায়, দালানের ছায়া পৌঁছয় নদীর ওপারে। ফলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘাটে মৃদু একটি আলোর আভা থাকে, ব্যস্ততা বিরল পরিবেশের সঙ্গে ভালো মানায়।'

উদ্ধৃতিটি থেকে সত্যজিৎ রায়ের কাজের ধরন ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। শুধু বিশেষণ ব্যবহার করে বিষয় বা বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতা রাখেন না। বিশ্লেষণ করে খতিয়ে দেখতে চান। *চারুলতা* ছবিতে অমল চারুকে তার লেখা সম্পর্কে মতামত চেয়ে বলেছিল, 'তোমাকে বলতে হবে— তোমার মতামত চাই। ভালো হলে কেন ভালো, খারাপ হলে কেন খারাপ।' একই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবিতেও পরিবেশকে ব্যবহারের কথা ভাবেন এবং সে সম্পর্কে লিখেছেন 'নভেম্বর মাসের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে চিত্রনাট্যে মেঘ, রোদ, কুয়াশা সবরকম উপযোগী দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো।' সত্যজিৎ রায়ের কাজের ধরন অনুযায়ী শুটিং শুরু হওয়ার আগে থেকেই তাঁর অতি পরিচিত লাল খেরোর খাতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজের খুঁটিনাটি লিখে রাখার সুবাদে ও দার্জিলিঙের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাহিনির সঙ্গে উপযোগী করে তোলার জন্য মাত্র ২৬ দিনে শুটিংপর্ব শেষ করেন। আর সে জন্য কাঁচা ফিল্মের খরচার পরিমাণও হয় খুব অনুকরণীয় অনুপাতে।

এই দার্জিলিং শহরের প্রেক্ষাপটে ছবিতে এসেছে নেপালি ভিখারি ছেলেটি, নেপালি গান, সেই অনুযায়ী আবহসঙ্গীত, টাইটেল কার্ড, ঘোড়ায় চড়ে ম্যালের চারপাশ ঘোরা, গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাখি খোঁজা, বরফে ঢাকা পর্বতমালা দেখতে পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তা, কুয়াশা ঘেরা দৃশ্যাবলি, দৃশ্যের আলো-আঁধারি মুহূর্ত, গলায় ঘণ্টাবাঁধা পশুর চলার শব্দ, আর সবশেষে এই রহস্যময় পরিবেশের প্রবল প্রভাবে হঠাৎ নিজেদের সঙ্কুচিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সাহস। পালটে যাওয়া দিনের আলো-ছায়া যে পরিবেশের মুডকেও যথার্থ প্রতিফলিত করতে পারে সেটাও তাঁর নজর এড়ায়নি, যেটা তাঁর ডায়রিতে লেখা বেনারসের ঘাটের বর্ণনার মধ্যেও স্পষ্ট।

কাঞ্চনজঙ্ঘা সত্যজিৎ রায়ের প্রথম রঙিন ছবি। তাই তিনি ঠিক করলেন এই রঙিন ছবিটিতে 'কালার হারমনির নিয়ম মেনে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করা হবে এবং দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্রকলার রঙ ও কম্পোজিশনের সাবেক নিয়মগুলো মেনে দৃশ্যগ্রহণ করা হবে।' এক চরিত্রের সঙ্গে আরেক চরিত্রের শ্রেণিগত পার্থক্য রঙিন ছবিতে অনেক তীক্ষ্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবির আট-ন'টি প্রধান চরিত্রের পোশাক নির্বাচনে সেই সব চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত রুচি, মানসিক অবস্থা এ সব কিছুর ইঙ্গিত স্পষ্ট। ছবিতে রঙের ব্যবহারে মেঘলা পরিবেশের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে কাহিনির নাটকীয় সঙ্ঘাত গড়ে তুলেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের এ ছবিটি নানা কারণে আগের ছবিগুলি থেকে স্বতন্ত্র। নামকরা সাহিত্যিকদের কাহিনি নিয়ে পরপর সাতখানা পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি করার পর তিনি মনস্থ করলেন এবার নিজের ভাবা বিষয় নিয়ে ছবি করবেন। *তিনকন্যা*কে আমি একটি কাহিনিচিত্র হিসেবে গণ্য করেছি যদিও এটি তৈরি তিনটি ছোটগল্প নিয়ে। তা ছাড়া এর অব্যবহিত আগেই *রবীন্দ্রনাথ* তথ্যচিত্রটি তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। এ বারের ছবির বিষয়টি তাঁর কোনও গল্প হিসেবে প্রকাশ পায়নি। নিছক ছবির জন্য ভাবা বিষয়, তাই একে ভাবাও হয়েছিল স্ক্রিপ্টের ফর্মে। বক্তব্য এমন কিছু চমকপ্রদ নয়, তবে ঘটনা বিন্যাসে মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। ছবির জন্য সংলাপ লিখে তাঁর আত্মবিশ্বাস ইতিমধ্যে বেড়েছে এবং তাতে অনেকটাই পোক্ত হয়েছেন। *পথের পাঁচালী* তৈরি করার সময় বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকেই সরাসরি সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি পরিস্থিতির জন্য বাড়তি সংলাপের প্রয়োজন হওয়ায় আশিস বর্মনের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখা সংলাপ মনোমতো হয়নি বলে বাতিল হয়ে যায়, এবং নিজেই সে কাজটি সম্পন্ন করেন। এমনকী *জলসাঘর* তৈরির সময়ও লেখক তারাশঙ্করকে অনুরোধ করেছিলেন স্ক্রিপ্ট (ও সংলাপ) রচনার জন্য, তাও তাঁর মনোমতো হয়নি। কেন হয়নি তা আমরা পরে বুঝতে পারি ছবিটি দেখে ও তারাশঙ্করের লেখা, যা *এক্ষণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, চিত্রনাট্যের নমুনা দেখে। সংলাপ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল, 'চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দুটি কাজ। এক, কাহিনিকে ব্যক্ত করা, দুই পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনিতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে-কাজ হয়। পরিবেশ বর্ণনার জন্য কথার প্রয়োজন নেই, ছবিই সে-কাজ করে। চরিত্র বর্ণনার আকৃতিগত দিকটা ছবিতেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির দিকটা কিছুটা অভিনেতার ভাবভঙ্গি, বাকিটা তার সংলাপে প্রকাশিত হয়। ছবি দিয়ে যা বলা সম্ভব হল না, সংলাপে কেবল সেইটুকুই বলার চেষ্টা করা উচিত।' তিনি সংলাপ লেখেন ছবির চরিত্রটির কথা ভেবে এবং সেই চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন তাঁর কথাও ভেবে, যাতে তাঁর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গিতে কথা বলা আড়ষ্ট না হয়ে খুব স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়। এ ছবির সংলাপ রচনার সময় তিনি বিবেচনা করেছেন 'মানুষে মানুষে শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও পার্থক্য এসে পড়ে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষায় ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেউ কেউ ইংরেজি শব্দ বর্জন করার অভ্যাস করছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। শিক্ষিত বাঙালির সংলাপে ইংরেজি কথার ব্যবহার তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

শুধু সংলাপ-ই নয়, নিজের গল্প নিয়ে ছবি করার পেছনে কারণগুলির মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কাজ করেছে যে প্রথিতযশা লেখকদের গল্প বা উপন্যাস থেকে করার পর তাঁকে নানান রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, নিজের গল্প হলে সে বালাই নেই। তবে এই কারণটা খুব জোরালো নয় এ জন্যে যে, এর পর পরবর্তী অনেক ছবিই আবার বিভিন্ন লেখকের গল্প বা উপন্যাসকে অবলম্বন করে তৈরি করা এবং সেখানেও তৈরি ছবি যথার্থ সাহিত্যানুগ হয়নি বলে তাঁকে নানা জবাবদিহি করতে হয়েছে বা কড়া প্রতিবাদ, যার থেকে অবশ্য অনেক মূল্যবান মন্তব্য বা বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে যা একজন চলচ্চিত্র অনুরাগীর কাছে অবশ্য শিক্ষণীয়। তবে যে কোনও মৌলিক শিল্পী সর্বদাই নিজের শক্তি নিয়ে বা তাঁর প্রকাশ মাধ্যম নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালবাসেন। সত্যজিৎ রায়ও তাঁর সমগ্র ছবি করার জীবনের নানা সময়ে সেটা করে গেছেন, এবং এই ছবিটি সে দিক থেকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

এ ছবির কাঠামো একেবারেই চলচ্চিত্রের কাঠামো। এত দিন তাঁর ছবিতে আমরা একটা একরৈখিক ন্যারেটিভ স্টাইল বা লিনিয়র ফর্মের হদিশ পাই। অষ্টম কাহিনিচিত্রটির কাঠামো সে দিক থেকে ব্যতিক্রম, একে বলা যেতে পারে সার্কুলার। একে তিনি ভেবেছেন পাশ্চাত্য মার্গ সংগীতের কাঠামোতে। Rondo structure-এ, যেখানে কয়েকটা সুর ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে আসে। একটা মূল সুর শুরু হয়ে তার গতিপথে বিভিন্ন বিরোধী সুরের আভাস পায়, যা ক্রমে একটা দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়— point আর counter point। সেই দ্বন্দ্ব কাটিয়ে প্রধান সুরটির গতি ক্রমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তার গতিপথে কোনও একটা সুর ধরে আবার মূল সুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। সুরের এ রকম বিস্তার ক্রমাগত নানান আশঙ্কার প্রকাশ করে এক অভাবনীয় সূত্রপথ ধরে মূল সুরে ফিরে ফিরে আসে। সুরের এই আপাতবিরোধী ভাব, নানাবিধ অলঙ্কার বিস্তার ও অন্তিমে মূল সুরে আত্মসমর্পণ একটি সম্পূর্ণ সাংগীতিক সংহতির রূপ নেয়।

কৈশোর ও প্রথম যৌবনে সত্যজিৎ রায়ের তীব্র অনুরাগ ছিল পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি। সিনেমা দেখা ছিল তাঁর নেশা বা শখ। তিনি চর্চা করেছেন পাশ্চাত্য সংগীতের, তাই পরবর্তীকালেও এরই ফর্মের রূপান্তর দেখতে পাই তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রের বিন্যাসে। সংগীতের মতো চলচ্চিত্রও একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে চলে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন 'শটের পর শট জুড়ে গল্প বলার প্রয়োজনে চলচ্চিত্রের সাংগীতিক ফর্মের সঙ্গে মিল আছে। বিভিন্ন ভাব সম্বলিত শট পর পর জুড়লে শুধু যে গল্প বলার কাজ হচ্ছে তা নয় তার সঙ্গে কাহিনি বিন্যাসের একটা ছন্দের সঞ্চার হচ্ছে। সংগীতের তাল, ফাঁক, লয় ও স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা বা ওঠা-নামার সঙ্গে সুরের ভাব-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের যেমন একটা মিশ্র ছন্দ তৈরি হয়, তেমনি চলচ্চিত্রের দৃশ্যবস্তু থেকে

ক্যামেরার দূরত্বের তারতম্য ও শটের তারতম্যের সঙ্গে বিষয়বস্তুর ভাব-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে একটা জটিল মিশ্র দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।'

সিম্ফনির ঢঙে তৈরি এই ছবিতে ঘটনার সময় আর আমাদের ঘড়ির সময় একই সঙ্গে চলে, ঘটনাটিকে বিন্যস্ত করা হয় স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যে। ছবির শুরুতে লং শটে দেখি, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। গির্জার ঘড়িতে তখন চারটে বাজার শব্দ শোনা যায়। এর কিছুক্ষণ পর ম্যালে জগদীশের মুখে শুনি It's quarter past four now। ছবি দেখার তখন পনেরো মিনিট সময় এগিয়েছে। তার পরের একটা দৃশ্যে, অণিমা যখন পার্কে ঢুকছে তখন আবার ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ শোনা যায়। গল্পও তখন আমাদের ঘড়ির সময় অনুযায়ী এক ঘণ্টা পার হয়ে এসেছে। এর ৪০ মিনিট পর ছবি শেষ হয়। সে হিসেবে ছবি চলার সময় ও ঘটনার সময় একই মাপে চলে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের মতো।

এ জন্য *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবিতে দৃশ্য ভাঙা হয়েছে, ভেঙে দৃশ্যান্তরে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কালপ্রবাহে কোনও ছেদ পড়ে না। শটের বা সিকোয়েন্সের সময় মেপে নিয়ে ছবির সময়গত ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে শুনেছি স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যর জন্য বা ছবির সময়গত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তিনি চিত্রনাট্য লেখার সময় সচেতনভাবে নজর রেখেছেন ফ্ল্যাশব্যাক না ব্যবহার করার বা এই পরিবেশ ছেড়ে দৃশ্যকে অন্য কোনও পটভূমিতে না দেখানোর।

তিনকন্যা থেকে সংগীত পরিচালনার ভার তিনি নিজেই নিয়েছেন। *রবীন্দ্রনাথ* তথ্যচিত্রটিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর হাতে সে ভার তুলে দিলেও এখানে আবার নিজেই সে দায়িত্ব নিয়েছেন। এতে 'সব কাজ নিজের হাতেই করব' এই যুক্তিকে ছাপিয়ে যেটা প্রাধান্য পায়, তা হল চলচ্চিত্রের আবহসংগীত সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও মৌলিক বোধ, যার প্রয়োগে তিনি তাঁর ছবির দৃশ্যকে (image) অর্থময়তায় আরও সংহত ও বিস্তৃত করে তুলতে পারেন। দৃশ্যার্থ সেখানে দৃশ্যরূপের গণ্ডি ছাড়িয়ে মুক্তি পায় সীমাহীনতায়। সর্বোপরি দৃশ্য ও ধ্বনি দুয়ের সার্থক পরিপূরক হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ছবির রীতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বদলায় কাহিনি প্রকাশের ঢং, ক্যামেরা ও শব্দের ব্যবহার, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, অভিনয়ের রীতি, সম্পাদনার কায়দাকানুন। এর সঙ্গে তাল রেখেই ঠিক করতে হবে আবহসংগীতের ঢং, অর্থাৎ ছবির মেজাজই আবহসংগীতের রূপ নির্ধারিত করে দেবে। 'একদিকে পাহাড় অন্যদিকে ইঙ্গবঙ্গ ভাব— এই দুটি মূল সূত্র থেকে *কাঞ্চনজঙ্ঘার* আবহসংগীতের উদ্ভব। পাহাড়ী লোকসংগীতের সুর ইচ্ছেমতো ভেঙ্গে ও বিলাতী যন্ত্রে একক ও

সমবেতভাবে বাজিয়ে এ ছবির মেজাজ আনার চেষ্টা করা হয়েছিল।' তবে ছবির স্ট্রাকচারটাই এত মিউজিকাল, এখানে সংগীত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি খুব একটা।

যে কাহিনিকে ভাবা হয়েছিল বাগানবাড়ির পরিপ্রেক্ষিতে, সে প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের জন্য নামকরণেরও অনেক বাছাই-বদল হয়েছে। '*দার্জিলিং*', '*ছুটি*', '*ভ্রমণকাহিনী*', '*আনাগোনার পথে*' ও ইংরেজি নাম হিসেবে '*The Promenaders*', '*The Darjeeling Story*' নামগুলোর কথা ভেবেও *কাঞ্চনজঙ্ঘার* মতো একটা সোজাসাপ্টা নাম রাখা হয়েছে, যার ব্যঞ্জনা ছবির বা কাহিনির শেষে পরিষ্কার হয়ে যায়। চরিত্রের পদবি নিয়েও চিন্তাভাবনা কম হয়নি। চরিত্রগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা ভেবেই তিনি স্থির করেন তাদের নাম ও পদবি। এ ছবিতে ইন্দ্রনাথের পদবি মল্লিক, লাহিড়ি, চ্যাটার্জি, বিবেচনার পর তিনি 'চৌধুরি' বেছে নেন। প্রণবেশ মৈত্র থেকে বানার্জি।

এ ছবির জন্য পাত্র-পাত্রীর প্রাথমিক তালিকা থেকে দেখা যায় যে সুব্রতর (বড় জামাই, অণিমার স্বামী) জন্য কালী ব্যানার্জিকে ও অণিমার (বড় মেয়ে) জন্য কণিকা মজুমদারকে ঠিক করা হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল অশোকের জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মনীষার জন্য শর্মিলা ঠাকুরকে ভেবেও পরে বাদ দিতে হয়।

শর্মিলার লেখায় পড়েছি '*দেবী*-র পর আবার ডাক এলো *কাঞ্চনজঙ্ঘা*-য়। মানিকদা বাবাকে চিঠি লিখলেন। তবে নামটা জি এন টেগোর-এর জায়গায় এ এন টেগোর লিখেছিলেন বলে বাবার ভ্যানিটিতে ভীষণ লাগল। বললেন, আমাকে চিঠি লেখার আগে আমার নামটা ঠিক করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এ ছবিতে তোমায় কাজ করতে দেব না। তাছাড়া সামনে আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাবার ভ্যানিটি বাদ দিয়েও বোধহয় আমি ছবিটা করতে পারতাম না।' আমাদের মনে হয়, সত্যজিতেরও এ ছবির জন্য মনীষার ভূমিকায় শর্মিলার বদলে একটি নতুন মুখ-ই কাম্য ছিল।

সৌমিত্র-র ব্যাপারে বিষয়টা ছিল ভিন্ন রকম। ছবির জন্য দার্জিলিঙে শুটিং করাটা ছিল আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সৌমিত্রর মুখে শুনেছি, যে সময়টাতে শুটিং শুরু হবে অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ দিকটায়, সে সময় অন্য ছবির কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি টানা দশ দিনের জন্য সময় (স্টুডিওর পরিভাষায় date) দিতে পারছিলেন না। অগত্যা, সত্যজিৎকে অন্য অভিনেতার খোঁজ করতে হয়। *কাঞ্চনরঙ্গ* নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সুখ্যাতির খবর তাঁর কানে আসে। চেহারা ও অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য তিনিই এ ছবির জন্য নির্বাচিত হন। পরে সত্যজিতের মনে হয়েছে সৌমিত্রকে এ ছবিতে না নিয়ে ভালই হয়েছে। কেননা কাহিনিটি যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে অশোকের চরিত্রে সৌমিত্রর মতো একজন

রূপবান ও জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনয় করলে মনীষার পক্ষে প্রণবেশকে (যে যতই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সফল হোক না কেন) ছেড়ে চলে আসাটা দর্শকের কাছে সহজ অনুমানসাধ্য হয়ে পড়ত। তা ছাড়াও, সৌমিত্র-র উপস্থিতিতে মনীষা ও অশোকের সম্পর্কে সাবলীল বন্ধুত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে প্রেমের অনুষঙ্গ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। যেটা সত্যজিতের মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

২১ অক্টোবর ১৯৬১ তারিখে সত্যজিৎ রায় সদলবল দার্জিলিং রওনা হন। এবং টানা ছাব্বিশ দিনের মধ্যে এ ছবির শুটিং পর্ব শেষ।

*

১৯৬২ সালে Lester Peries-কে লেখা একটি চিঠিতে সত্যজিৎ রায় এই ছবির চরিত্রগুলির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে— a domineering British title holding father, resigned once talented mother, bird-watching philosophical brother-in-law, brink of divorce elder daughter and husband, play-boy son, sensitive younger daughter, eligible prosaic bachelor suitor and young unemployed intellectual stranger।

এ বারে দেখা যাক এই চরিত্রগুলির সঙ্গে ছবিতে আমাদের কীভাবে পরিচয় ঘটে। প্রধান চরিত্র ইন্দ্রনাথ। A domineering British title holding রায় বাহাদুর। পাঁচটা কোম্পানির চেয়ারম্যান। আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণায় জীবনে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ। সকল দিক থেকেই কৃতকার্য। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে দাম্ভিক, উন্নাসিক, পরমত-অসহিষ্ণু ও নিজেকে নিয়েই মগ্ন। বৈষয়িক কারণ ছাড়া আর কোনও কিছুতে আগ্রহ নেই। রোস্ট করে না খাওয়া গেলে পাখিও তার কাছে অর্থহীন। পুরোনো গৌরবের মধ্যে বেঁচে আছেন তাই বাস্তব-সম্পর্কশূন্য। দেশের লোকের চাইতে আজও সাহেবদের গা ঘেঁষাঘেষি করতে ভালবাসেন। তাদের দেওয়া খেতাব নিয়ে গর্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দর্শকের মনে হয়, শাসকদের প্রতি এই আনুগত্য তাঁর মনুষ্যত্বকে প্রান্তসীমায় ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষকে অবজ্ঞা করতে ভালবাসেন। নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ আত্মম্ভরী এক বন্দি মানুষ। এত সাহেবি ও কেতাদুরস্ত হয়েও তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার মুখে দূরে নীচে একজন অচেনা লোকের হাঁচির জন্য তিনি স্ত্রীকে একটু থেমে রওনা দিতে বলেন, 'শুভ কাজে বাধা পড়বে' এই আশঙ্কায়। অন্য মানুষের মন বলে যে একটা পদার্থ আছে, সে খেয়াল রাখেন না বলে নিজের মতটাকে জোর করে যেনতেন-প্রকারেণ অন্যের ওপরে চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠাহীন। ছবির সূচনায় এই মানুষটিকে দেখি এক আত্মতৃপ্ত ভঙ্গিমায় হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে। তেজ ও পৌরুষের আভা

ছড়িয়ে সারা শরীরে। একজন বিদেশিকে দেখে কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কথার সূত্রে জানা যায় এখানে প্রায়ই আসেন, জায়গাটা তাঁর পছন্দ, কেননা বিদেশিদের তৈরি শহর, ছিল তো লেপচাদের একটা গ্রাম। আর এই বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি হল পৃথিবীর সর্বোত্তম দৃশ্য। এ যাত্রায় একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়নি, আজই থাকার শেষ দিন, মনের জোরে মেঘ কেটে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখর দেখা যাবে এই আশা। তার মনের জোর সম্পর্কে দম্ভও মিশে আছে। ছবির আগাগোড়া জুড়ে থাকা এই চরিত্রটির দম্ভ ও অহঙ্কার নানা ঘটনায় মাটিতে মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতাই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু।

লাবণ্য তার স্ত্রী। চাপা স্বভাবের, অনুভূতিপ্রবণ। Resigned once talented... মুখ বুজে স্বামীর দাপট সহ্য করে, জীবনে আর পাওয়ার হয়তো কিছুই নেই। তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সমর্পিত। ভেতরের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও গুণগুলো হারিয়ে গেছে। দুঃখ, অসহায়তা নিয়ে এক সমর্পণের চেহারায় তাকে দেখি আমরা। ছবির মাঝখানে তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি গান গাইতে দেখা যায়। এ পরবাসে রবে কে, হায়। আজীবন দীর্ঘ পরবাসে কাটিয়ে আসা মানুষটির নিজের সত্তার অন্তররূপ প্রকাশ করে এই গানের ভাষা। তাই, এমন পরিবেশে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই এ গান তার কণ্ঠে উঠে আসে। এ যেন তার কান্নার প্রতিধ্বনি, অসহায় মনের আর্তনাদ। সহানুভূতিশীল দাদা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে গান শোনে, বোনের মনের ভাব বুঝে গান শেষ হলে পিঠে আলতোভাবে আশ্রয়ের হাতখানা রাখে। সেই কোমল স্পর্শ লাবণ্যকে কাঁদায় না, বরং পরিবেশের প্রাবল্য ও স্নেহময় সহানুভূতি তাকে প্রতিবাদী হতে সাহায্য করে। সে দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করে, মণিকে বলব, এক্ষুনি বলব, তার মন যা চায় তাই যেন করে। ছোট মেয়ের জীবন তার জীবনের মতো যেন না হয় এই আশঙ্কায় সে চায় ছোট মেয়েকে মুক্ত করতে। মানুষ মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়, নিজের মতো চলার অধিকার চায়। স্ত্রী-পুরুষ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় আমাদের মনোভাব এমনই হয়ে গেছে যে, কেউ কেউ অন্যায় জোর ফলায় আর অনেকে তা মুখ বুজে নির্বিচার সহ্য করে। যুগ পাল্টেছে, মানুষের মন পাল্টায়নি। মানুষগুলো রয়ে গেছে আজও অপরিবর্তিত। এই দমন, এই শোষণ সমাজের সর্বত্র। এ ঘটনা একটা উপমা মাত্র।

এই মনোভাবের জন্যই এত সচ্ছল পরিবারের আঁটোসাঁটো শাসনের মধ্যেও একমাত্র ছেলে এখনও অপরিণতমনস্ক, চপলতায় অস্থির। জীবনের কোন লক্ষ্যের পেছনে সে ঘুরে বেড়ায় বা লক্ষ্যহীন হয়ে সে কীভাবে দিন কাটায়, সে দিকে কেউই খেয়াল রাখে না।

পরিবারের বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক এখন টালমাটাল অবস্থায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই দু'জনের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ নিয়ে একই ছাদের তলায় মিথ্যা সংসার, মিথ্যা দাম্পত্য সম্পর্কের ভান করে আছে। তাই শঙ্করকে দেখি হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থায়। জীবনের সব উৎসাহ যেন তার ফুরিয়ে গেছে। ঔদাসীন্য তাকে কিছুটা উন্নাসিক করে তুলেছে, তবুও মানুষটির মধ্যে শুভবোধ একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। স্বেচ্ছায় সে মনীষাকে বলে নিজের মনের দিকে তাকাতে। eligibility-র প্রকৃত অর্থকে জীবনের সামগ্রিক পরিসরে দেখার জন্য, তাৎক্ষণিক বিচারে নয়। তবে গোটা ছবির মধ্যে এই অণিমা-শঙ্করের সম্পর্কটি আমার কাছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও কিছুটা সাজানো মনে হয়েছে। আমি অনেক দিন ভেবেছি, শঙ্করের মতো মানুষ কেন তার মেয়ে-বউকে নিয়ে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শ্বশুরের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে এল। বা অণিমার প্রেমিকটির কি তর সইছিল না যে, বেড়াতে আসা এই ক'টা দিনের মধ্যেই চিঠি লেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অণিমা কি তাকে লেখা চিঠিগুলো সব সময়ই তার কাছে কাছে রাখে, সময়মতো যাতে সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলা যায়। মেয়ের কথা ভেবেই হয়তো তাদের এই সমঝোতা করে থাকার চেষ্টা। এই পরিবেশের বিশালত্ব catalyst-এর ভূমিকা নেয়। বিরাটত্ব সামনে এলে অনেক জটিল সমস্যাও তুচ্ছ বলে মনে হয়, যেটাকে সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়ানো নিছকই অপ্রয়োজনীয়।

মনীষা প্রথম দৃশ্য থেকেই আনমনা, নিজেকে সুন্দর করে সাজানোর ইচ্ছেটুকুও নেই। মনের অনিচ্ছায় জোর করে কাজ করতে হচ্ছে বলে হতোদ্যম। গভীর প্রকৃতির মেয়ে। সূক্ষ্ম রুচির। তাকে বুঝতে হলে চাই সময়, ধৈর্য, সরলতা। যে সারল্য মানুষকে সহজ হতে শেখায়, জীবনের প্রতি কৌতূহলী করে।

প্রণবেশের ছবিতে আবির্ভাব হিরোর ভঙ্গিতে। হাত দুখানা দু'পাশে প্রসারিত করে অভিবাদন করার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় 'আমি এসেছি, দ্যাখো তোমরা, আমি মঞ্চে অবতীর্ণ'। সে টের পেয়েছে এই পরিবারটির প্রধান কর্তা তার ছোট মেয়ের পাত্র হিসেবে তাকে পাওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। প্রণবেশ একজন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। বড় চাকরি করে। প্রথাগতভাবে অতি লোভনীয় পাত্র। eligible bachelor। এ ব্যাপারে সে খুবই সচেতন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে প্রণবেশ মনীষার সঙ্গে কথা বলে কোন ভাষায়, কোন বিষয়ে, কোন সুরে? ক্রমে তার prosaic রূপটা প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম রুচি মনীষার কাছে অসহ্য লাগে। প্রণবেশ শুধু তার কথাই বলে— তার চাকরির কথা, তার ক্ষমতার কথা, তার গৌরবের কথা, বিলেতের কথা। [ছবিতে প্রণবেশের সঙ্গে শুরুর দিকে কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে হয় ওদের আলাপ যেন একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। কথোপকথনে মনেই হয় না

যে ওদের এর আগে দেখা হয়েছে, পাহাড়ের এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছে, এমনকী মনীষা প্রণবেশের কাছ থেকে উপহারও (কানের দুল) পেয়েছে]। এই পরিবেশ তার মনে কোনও প্রভাবই ফেলে না। মনীষার সম্পর্কে, আশেপাশের মানুষদের সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই। প্রণবেশ শিক্ষিত, ভদ্র, সামাজিকভাবে কেতাদুরস্ত। কিন্তু সে কি নিজের দম্ভ অহঙ্কারকে ছাড়িয়ে একজন প্রেমিক হিসেবে মনীষার কাছে দাঁড় করাতে পেরেছে? মনীষার ক্রমশই তাকে আরও অচেনা লাগে, তার কথাগুলো শূন্যগর্ভ শব্দের ফুলঝুরি বলে মনে হয়। মনে হয়, এই আত্মম্ভরী প্রেমহীন মানুষটি জীবনের কোন ঐশ্বর্য তার প্রেমিকাকে দান করবে? পাশাপাশি মনীষার অশোককে অল্প সময়ের পরিচয়েই খুব সহজ বলে মনে হয়। ছবিতে শুরুর দিকে অশোক তার কাকার সঙ্গে ম্যালের দিকে উঠে আসছে। লক্ষণীয়, ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরিবার পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচে নামে, ম্যালে পৌঁছনোর জন্য। অশোক ও তার কাকা পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে আসে। হোটেলের অবস্থানে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণি-চরিত্রটা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরিচিত ইন্দ্রনাথকে দেখে কাকা উৎসাহের আতিশয্যে ভাইপোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য ও সেই সঙ্গে তার চাকরির জন্য দরবার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। অশোক খুব কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে কাকার এই ব্যবহারে। মৃদু প্রতিবাদের পর সে এগিয়ে আসে পরিচয়ের জন্য। কেননা একটা চাকরি তার নিতান্তই প্রয়োজন। অশোক পরিচালকের বর্ণনায় Young unemployed intellectual stranger। খুবই সাধারণ অবস্থার এই বেকার যুবকটি ব্যবহারে সহজ, মনোভাবে কৌতূহলী ও স্বভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। এক সময় ছবিতে অশোক ও পক্ষীপ্রেমিক জগদীশকে দেখি অপূর্ব দৃশ্যাবলির সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

রসপ্রিয় জগদীশ যেমন প্রকৃতিপ্রেমিক, তেমনই অনুভূতিপ্রবণ। আণবিক বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার দূষণে যদি ক্ষুদ্রপ্রাণ পক্ষীকুল বাঁচার সঙ্কটে পড়ে, তার পর একদিন বিরুদ্ধ পরিবেশে প্রাণরক্ষা করতে না পেরে মৃত পাখিগুলি বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুপটুপ করে মাটিতে মিশে যায়, এই আশঙ্কায় সরলহৃদয় মানুষটি উদ্বিগ্ন। অশোকও এই উদ্বেগের অংশীদার হয়। জগদীশ একমাত্র অশোকের সঙ্গেই প্রাণের কথা বলতে পারে। আর পারে মনীষা। প্রণবেশের সঙ্গে এতক্ষণ সময় কাটিয়ে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। দম বন্ধ হওয়া পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে, সে অশোকের সঙ্গে কথা বলে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অশোকের ওপর আস্ফালন ফলিয়েছেন, অশোক সরল মনে তাঁর আদেশ পালন করেছে, তাঁর গৌরবের গল্প শুনেছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে

কথা বলার পর সে আর মুখ বুজে সহ্য করেনি। হতে পারে সে চাকরিপ্রার্থী, হতে পারে সে বেকার, কিন্তু কারও করুণার পাত্র সে নয় যে, সে অসম্মান সহ্য করবে। চাকরির প্রয়োজন সত্ত্বেও অশোক অনায়াসে ইন্দ্রনাথের করুণা প্রত্যাখ্যান করে বলিষ্ঠভাবে এবং সে-ই প্রথম ইন্দ্রনাথকে আঘাত হানে প্রকাশ্যে। মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র অশোক এই ঘটনার কথা বলে, সেই সঙ্গে অনুশোচনার কথাও জানায়। এতে তার সহজ মনের পরিচয় আমরা পাই। তার চাকরির প্রয়োজন আছে কিন্তু আত্মসম্মানবোধও আছে, নো চ্যারিটি। আবার অনুশোচনাও আছে। অশোক মুখোশ-পরা মানুষ না, সে লোকের সঙ্গে মেশে সহজে, সরলচিত্তে। ছবির এই দৃশ্যটিতে সংলাপের ভাষা বা কথা বলার ভঙ্গি ভিন্ন রকম, এতক্ষণে এরা দু'জনে যেন প্রাণখুলে কথা বলতে পারছে। অশোকের কথার সূত্রে বেরিয়ে আসে তার ধার-করা প্যান্ট পরে বেড়াতে আসা বা গড়ের মাঠে এক সাহেবের কুকুরের তাকে কামড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ। মনীষা অশোকের মায়ের সুস্থ হয়ে ওঠার কামনা করে প্রাণের থেকে—ভদ্রতার খাতিরে নয়। অশোকের সঙ্গে আমরাও বুঝতে পারি, বলার ধরন থেকেই তা বোঝা যায়। 'কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতে আসবেন', 'আমাদের বাড়িতে কুকুর নেই'... 'আমার বন্ধুদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে না', মনীষার এই অভিব্যক্তিতে একটা তাৎক্ষণিক পছন্দের প্রকাশ আছে, হয়তো অশোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে সে পর্বটা কলকাতায় ফিরে এলে শুরু হলেও হতে পারে। ছবিতে এদের সম্পর্ক এই সীমানার বাইরে আর যায়নি।

লাবণ্য বিদ্রোহ করেছে, ইন্দ্রনাথ জানেনও না। মনীষা প্রত্যাখান করেছে প্রণবেশকে, ইন্দ্রনাথ এখনও টের পাননি। শঙ্কর এই মানুষটির প্রতি কোনও শ্রদ্ধাই পোষণ করে না, তা-ও হয়তো তিনি জানেন না। এই ভাবে একজন আত্মম্ভরী দাম্ভিক মানুষের বিপর্যস্ত চেহারা দেখা যায় ছবির শেষে। ছবিতে সব ক'টি চরিত্রের ওপর কোনও না কোনওভাবে এই পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়, একমাত্র ইন্দ্রনাথ ও প্রণবেশ ছাড়া। এই দু'জনই অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে থেকে আত্মমগ্ন। তারা কোনও অবস্থাতেই নিজেদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। বরং দার্জিলিঙের romantic surrounding-এ মনীষার হয়তো মতিভ্রম হয়েছে, যে জন্য সিকিউরিটি-র চাইতে প্রেমকে সে বেশি মূল্য দিচ্ছে এবং তাই প্রণবেশ তাকে একটু ভাববার সময়ও দেয়। মনীষার 'আর এখন' প্রশ্নের উত্তরে সে যখন বলে you are free now, তখন মনীষার হাঁফ ছেড়ে বাঁচার অভিব্যক্তি তার নজর এড়ায় না। বুঝতে পারে যে, সে হেরে গেছে। দম্ভ আর অহঙ্কার ঘেরা এই মানুষটি একটি নারীর হৃদয় জয় করতে অক্ষম হল। নেপালি ভিখিরি ছেলেটিকে

চকোলেটটা দিয়ে সে বলে 'তোরই জিৎ'। একমাত্র ইন্দ্রনাথ ও প্রণবেশ এই দুটি চরিত্রই ছবিতে diminish করে শেষ পর্যন্ত।

গোটা দার্জিলিং শহর যখন দৃশ্যমান অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যে ভাস্বর, তখন তাকে চোখ মেলে উপভোগ করার মতো এ পরিবারের একটি মানুষও ম্যালে নেই।

ছবিটিকে আজও দেখলে মনের মধ্যে একটা ভাবের রেশ থেকে যায়। আমরা সমাজবদ্ধ পরিবারভুক্ত মানুষ। একই সময়ে, একই দেশে বা একই ছাদের তলায় আমরা দিন কাটাই। অথচ এই সান্নিধ্য আমাদের কাছে টানে না, পারস্পরিক ব্যবধান ঘোচায় না। আমাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে, নিজের মনোভঙ্গি নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকি যে, অন্যের কথা ভাববার সময় কই? আমরা একই বৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ পরস্পরের মধ্যে কত অনতিক্রম্য ব্যবধান।

যে নেপালি ছেলেটি সারাক্ষণ সকলের পেছন পেছন ঘুরে বেড়িয়েছে সামান্য ভিক্ষার আশায়, সে শেষে চকোলেট হাতে পেয়ে খুশির আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। সে গানের সুর আমাদের বেদনা-শিথিল মনে স্পষ্ট করে তোলে এই দীন অস্তিত্বকে। দৈনন্দিনতার মেকি আবেষ্টন থেকে নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার ইচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে। গানের সহজ সুর আর প্রকৃতির মহিমান্বিত অপার সৌন্দর্য আমাদের ভারহীন এক মুক্ত ভুবনের ইঙ্গিত দেয়।

*

১৯৬২ সালের ১৯ মে তারিখে ছবিটি মুক্তি পায় কলকাতায়— রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে। প্রথম দিকে, সে সময়ের অনভ্যস্ত দর্শকের প্রতিক্রিয়া একটু নিস্তেজ থাকলেও পরবর্তীকালে এই ছবিটি দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

*

আদরের ছোট্ট মানিককে একটি চিঠিতে তাঁর ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায় লিখেছিলেন— 'কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে কেমন লাগে দাদু? বড় হয়ে তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আঁকবে, রং দিয়ে। আমি কি সে সব দেখতে পাব, দাদু? এতদিন বেঁচে থাকব কি না জানি না— আমি যে বুড়ো হচ্ছি।' পরিণত বয়সে এসে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রিয় ধনদাদুর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি এঁকেছেন। রং দিয়ে— তবে তুলি দিয়ে নয়। তাঁর ধনদাদু এ ছবি দেখে যেতে পারেননি, পারলে কত খুশিই না হতেন!

ভূতের রাজা দিল বর

উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে ভূত আছে। ভূতের নাচও আছে। রূপকথার মোড়কে লেখা গল্পে ভূত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঠাকুরদার এ গল্প নিয়ে ছবি করার সময় সত্যজিৎ রায়ও অনিবার্য কারণেই ভূতকে এনেছেন। গল্পের খাতিরে ভূতের উপস্থিতি জরুরি। তবে উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের পাঠক হল শিশু ও বালকরা। আমাদের দেশে বালক বা শিশুদের সিনেমা দেখার চল নেই। তাই সত্যজিৎ রায় মূলত কিশোরদের জন্য ছবিটি তৈরি করলেও বিষয়ের উপস্থাপনায় ছোট-বড় মিলিয়ে সকলের কাছেই সেটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রত্যেকে বিভিন্ন স্তরে এর অর্থ খুঁজে পান।

ছবির জন্য উপেন্দ্রকিশোরের কথা-নির্ভর রূপকথাকে নিয়ে আসতে হয়েছে দৃশ্য-নির্ভর ফ্যান্টাসিতে। এর জন্য কাহিনি-বিন্যাসে অদলবদল অপরিহার্য। এই ছাঁটাই-বাছাইয়ের পরিমাণ ছবি-দেখার সঙ্গে গল্পকে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। গল্পের সঙ্গে ছবির একটি আকর্ষণীয় পরিবর্তন হল ভূতের নাচের দৃশ্য। এই বিশেষ দৃশ্যটিকে নিয়েই আমরা এখানে আলোচনা করব। গল্পে আছে 'এর পর ভূতেরা একজন দু'জন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।' এই বর্ণনাটিকে সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে রূপায়িত করেছেন সাড়ে ছ'মিনিট ধরে চলা নাচের দৃশ্যাবলি দিয়ে। সিনেমার পর্দায় ভূতের নাচ? এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে এমন কোনও দৃশ্য সিনেমায় দেখানো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

পর্দায় ভূতদের দেখাতে হলে একটা শারীরিক রূপ চাই। বাস্তব ক্ষেত্রে ভূতের অস্তিত্ব তো আমাদের মনের ধারণায়। তারা সব অবয়বহীন, অশরীরী। আমরা আমাদের নিজের নিজের কল্পনামতো মনের ধারণায় তাদের একটা চেহারা খাড়া করে নিই। রূপকথার বর্ণনায় আছে ভূতের কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চোখ। বই পড়ার সময় এই বর্ণনা থেকে আমরা আমাদের কল্পনায় একটা চেহারা এঁকে নিতে পারি। সাহিত্যে কোনও কিছুরই রূপগত দিক থেকে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, একটা আভাস পেলেই চলে। চলচ্চিত্রে তা হওয়ার জো নেই। তাই এই ছবির ভূতের রূপ, তাদের ধরনধারণ, চলাফেরা, নাচের ভঙ্গি সব কিছুই ভেবে স্থির করে নিতে হয়েছে। আবার সব ক'টি ভূতকে একই রকম না করে চেহারায় হাবেভাবে নাচের ভঙ্গিতে রকমফের আনলে নাচে বৈচিত্র আসবে। তেমনই শুধু নাচানাচি করলে তো চলবে না— তার মধ্যে একটা গতি আনা চাই, নাচের সূত্র ধরে ঘটমান একটা নাটক।

আমাদের মধ্যেই তো নানা রকম লোকজন আছে। চেহারায়-আচরণে শ্রেণিবিন্যাসে। ধরে নেওয়া যাক, মরে গিয়ে তারাও ভূত হয়েছে। নানা রকমের ভূত। ভূতের রাজ্যে তাই এত বৈচিত্র। সত্যজিতের কথায় (করুণাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার, কলকাতা ২ মে ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ, *এক্ষণ* শারদীয় ১৩৯৫ ব.) 'যারা মরেছে অ্যাকচুয়ালি— তাদের যদি ভূত হয়... কতকগুলি ক্লাস অব পিপল যারা বাংলাদেশে ছিল— রাজারাজড়া তো ছিলই, একেবারে বৌদ্ধ আমল থেকে এবং চাষাভুষোও ছিলো।' তাদের ভৌতিক সংস্করণ পর্দায় দেখানো যেতেই পারে। আর বিদেশ থেকে সাহেবরা এসেছিল এ দেশে রাজত্ব করতে। ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের উঁচু নিচু সব স্তরে। শাসন আর শোষণকে কায়েম করতে। নীলচাষের সুবাদে এরা ভিড় করেছিল গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র। মিশে গিয়েছিল সমাজের নিচুতলার সঙ্গেও, সরল সাধারণ মানুষ এদের মেনে নিয়েছিল। শুধু মানা নয়, দৌরাত্ম্য ও ধূর্তামির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে এদের প্রতিপত্তিও স্বীকার করে নিয়েছিল।

এ ছবির শুটিং যেখানে হয় তার দশ মাইলের মধ্যে ছিল খ্রিস্টানদের কবরখানা। *অভিযান* ছবি তৈরির সময় বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে সত্যজিৎ রায়ের চোখে পড়েছে নীলকুঠি, সাহেবদের কবরখানা, ইংরেজদের ফেলে যাওয়া নানান স্মৃতিচিহ্ন। আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টেরাকোটার মন্দির। এর ভাস্কর্য লক্ষ করেছেন তিনি খুঁটিয়ে। উদ্বুদ্ধ করেছেন বন্ধু ডেভিড ম্যাক্কাচিয়নকে তাঁর গবেষণার কাজে। একাধিক গল্পেও পাই গির্জা, কবরখানা, টেরাকোটার মন্দিরের কথা, পরিত্যক্ত নীলকুঠির প্রসঙ্গ। বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে লেখা সে সব গল্প।

ভূতদের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর মনে এসেছে সাহেব-ভূতদের প্রসঙ্গ। পুড়িয়ে সৎকার করা মরা-মানুষই যখন ভূত হয়ে আসে, তখন মাটির কবরস্থ মৃত সাহেবরা তো একেবারেই সশরীরেই আসতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যায় অধিকাংশ যে মানুষেরা চাষাভুষো দরিদ্র গোছের, তারা তো থাকবেই, এর সঙ্গে থাকতে পারে একদল সুবিধাভোগী, যারা সমাজে পরগাছা মতো। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' তাঁর বহুবার পড়া বই। এ ছবি করার সময় বেশ কিছু দিন এই বইখানি তাঁর পড়ার টেবিলে স্থান করে নিয়েছিল। এর থেকে আঁকলেন 'বাবু ইয়ার' শ্রেণির লোকজনকে। ফলে ভূতের শ্রেণিতে শ্রেণিতে এল বৈচিত্র, রূপে হল রকমফের।

সত্যজিৎ রায় ছবির জন্য চার শ্রেণির ভূতের চেহারা আঁকতে গিয়ে ভৌতিক আবরণ চেনা-জানা মানুষের চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এ যেন চেনা মানুষেরই অতিরঞ্জিত ভৌতিক সংস্করণ। অন্য দিকে উপেন্দ্রকিশোরের ঘরানায় ভূতের রাজার কথাবার্তা, মনের ভাব, ব্যবহারে দয়া-মায়া স্নেহমমতার স্পর্শ এনেছেন। এ সব ভূতকে দেখে আমরা ভয় পাই না। বরং কৌতূহলী আর্কষণ বোধ করি।

সত্যজিৎ রায় তাঁর খেরোর খাতায় চিত্রনাট্য লেখার সময় যে সব স্কেচ এঁকেছেন বা মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর চিন্তাভাবনা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভূতের শ্রেণি নির্বাচন ও শ্রেণিভুক্ত চরিত্রগুলির বাছাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম শ্রেণির ভূতরা হল রাজা বাদশা শ্রেণির। এখানে সত্যজিৎ স্কেচ করেছেন পৌরাণিক যুগের রাজার, বৌদ্ধ যুগের, কনিষ্কর আমলের, মদ্র দেশীয়, মোগল আমলের ও সাধারণ রাজার। ছয় রকমের মূর্তি দেখি পর্দায়। এই শ্রেণিবিন্যাস কেন? তাদের পোশাকের রকমফেরের জন্য, না ঐতিহাসিক পরম্পরার সূত্র জোগানোর জন্য! পোশাকে যদি ইতিহাস অলক্ষ্যে চিহ্নিত হয়ে যায় এই ধারণায় হয়তো কোনও গুরুত্ব না দিয়ে মৃদু পদ্ধতিতে রাজা বাদশা শ্রেণির রকমফেরকে দৃশ্যবদ্ধ করেছেন। তেমনই তৃতীয় শ্রেণির ভূত, যারা সাহেব ভূত, তাদের রকমফের ঘটানোর জন্য তিনি খেরো খাতায় আঁকছেন Hastings-এর স্কেচ— হাতে বন্দুক, Clive-এর— হাতে নস্যির কৌটো, চালিয়াৎ সাহেবের হাতে ছড়ি, Cornwallis-এর চোখে চশমা, সৈনিক সাহেবের হাতে তলোয়ার, নীলকর সাহেবের হাতে বোতল। বন্দুক, ছড়ি, তলোয়ার, বোতলে সাহেব শ্রেণির ভূতের ঐতিহাসিক চেহারাটাও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণির ভূতের বর্ণনায় সত্যজিৎ মন্তব্য করেছেন 'নাড়ুগোপাল ইত্যাদি'। এদের মধ্যে আছে বাবু (ইয়ার), বাবু (শহুরে), বানিয়া, টিকিওয়ালা পুরুত (গায়ে নামাবলি), হেডমাস্টার (হাতে ছড়ি), পাদ্রির (হাতে বাইবেল) স্কেচ। এরা মোটা ভূতের দল, জীবিতকালে

ছিল অতিভোজী মানুষ। চাষাভুষো শ্রেণির ভূতের রকমফের হল সাঁওতাল, চাষি, বাউল, মুসলমান, বিহারি দারোয়ান ও লাঠিয়াল। এ সব সাধারণ মানুষ বর্ণহীন। খেতে-পরতে না-পাওয়া মানুষের যে ভূতের মতো চেহারা হয়ে যায় তার খবর আমরা আজও পাই, সংবাদপত্রের মাধ্যমে, নানা লেখকের গল্পে।

চিত্ররূপ দেবার সময় সত্যজিৎ রায় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের আওয়াজের সঙ্গে ভূতের শ্রেণিবিভাগকে মিলিয়ে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলেলেন। মৃদঙ্গকে ব্যবহার করেন রাজা ভূতের সঙ্গে। মৃদঙ্গ হল পুরোপুরি ধ্রুপদী বাজনা। রাজা ভূতের নাচের ধরনটাও ধ্রুপদী ঢঙে। খঞ্জিরা হল মূলত লোকযন্ত্র। বাজানো হল চাষাভুষো ভূতের নাচের সঙ্গে। বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে এখানে নাচের ফর্মে আনলেন লোকনৃত্যের ছাপ। সাহেব ভূতদের সঙ্গে বাজে ঘট্টম। বাজনার কটকটে কেঠো আওয়াজের মতো নাচেও কাটখোট্টা ভাব। এদের নাচের ছবিও তোলা হয়েছিল ভিন্নভাবে— আন্ডার-ক্র্যাঙ্ক করে। ১ সেকেন্ডের ছবিতে ১৬টা ফ্রেম। সেটা পর্দায় প্রচলিত সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেমের গতিতে দেখানোর সময় ভূতদের চলাফেরা কেঠো ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। মোটা ভূতদের চলাফেরার জন্য বাজানো হয়েছিল মুড়শৃং। সেটাও এক ধরনের দক্ষিণ ভারতীয় লোকযন্ত্র। এর আওয়াজে এমন একটা কৌতুকভাব এনে দেয় যেটা নাচের ও ভূতের শ্রেণিচরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়।

সব ক'টি বাজনাই সাউথ ইন্ডিয়ান পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট। এদের আপাত-বৈপরীত্যের মধ্যে একটা অন্তর্মিলও আছে। সব ক'টিকে নিয়ে চমৎকার একটা কোয়ার্টেট তৈরি হয়। এক-একটা বাজনার সঙ্গে এক-এক শ্রেণির ভূতের যোগসূত্র তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে বাজনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট ভূতের কথা মনে আসে। ছবিতে দেখি এই চারটি যন্ত্রই শুরুতে বাজে ঢিমে লয়ে, আস্তে আস্তে ক্রমে মধ্যলয়ে পৌঁছয়। এভাবে পাঁচটা মুভমেন্টে লয় বেড়ে শেষে জলদে পৌঁছয়। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচের ঢং ও ছন্দে পরিবর্তন আসে। দ্রুত তাল ও লয়ের বাজনার সঙ্গে নাচে দেখা যায় ভূতেরা ক্রমশ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে জড়িয়ে পড়ছে। বাজনা জলদে পৌঁছে গেলে দেখি ভূতদের এমন অবস্থা যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেই যাচ্ছে। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না ম'লে'। এদেরও সেই অবস্থা। তবে ভূতদের তো মরণ নেই। মরেই তো তারা ভূত হয়েছে। তাই আবার তারা ভূত হয়েই থেকে যায়।

এই ছবির নৃত্য-পরিকল্পনায় ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ভূতের নাচের মধ্যে (রাজা-বাদশা ও চাষাভুষো শ্রেণির নাচ) শম্ভুবাবুর নৃত্যরীতির বৈশিষ্ট্য বেশ জোরালো ভাবেই লক্ষণীয়। রাজা-বাদশার নাচের ছন্দে দেখি ধ্রুপদী ভঙ্গি, গতি ও অঙ্গ সঞ্চালনে তেজ ও বলিষ্ঠতা। সাধারণ চাষাভুষোর নাচের ছন্দোময়তায়

সম্মিলিত নাচের (group dance) লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। শম্ভুবাবুর নাচের মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালনের স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় একটা পৌরুষভাব লক্ষ করা যায়। মৃদু পেলবতাকে ঠেলে রেখে তেজ ও দৃঢ়তার ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাষা শ্রেণির ভূতের নাচে, পরিচালকের পরামর্শমতো ছ'টি চরিত্রের জন্য আলাদা নাচের ধরন এনেছেন।

অন্য দুটি নাচকে চলতি অর্থে নৃত্যরূপ বলা যাবে না। বরং এখানে ক্যামেরার কারসাজিতে এদের অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরায় একটা ভিন্ন ধরনের choreography তৈরি করা হয়। এই দুটি নাচে প্ল্যাটফর্মের ডাইমেনশন আনতে স্পেসকে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন ভাবে। রাজা-বাদশা ও সাধারণ শ্রেণির ভূতের নাচের দৃশ্যে মূর্তিগুলিতে যে ঢেউ-খেলানো ভাবটা তৈরি হয়, সে সম্পর্কে সৌমেন্দু রায়ের কাছে শুনেছি যে এই দৃশ্যগুলিকে দু'বার করে তোলা হয়েছে। প্রথমবারের তোলা দৃশ্যকে বিশেষ ধরনের লেন্স ব্যবহার করে আবার তোলায় ওই special effect তৈরি হয়। ছবির এই গলে-গলে যাওয়া রূপটা একটা ভৌতিক ভাব এনে দেয়। রাজা-বাদশা ও চাষাশ্রেণির নাচে ছায়া পড়ে। শেষ দুটি নাচের দৃশ্য সম্পূর্ণ ছায়াহীন। মোটা ভূতের চলাফেরায় লক্ষ করি কৃষ্ণনগরী পুতুল-পুতুল ভাব।

চার শ্রেণির ভূত নৃত্যরত অবস্থায় পর্দায় আসে একের পর এক। শেষ পর্বে তাদের একসঙ্গে সারিবদ্ধ রূপের মধ্যে পাই মন্দির-ভাস্কর্যর রূপবৈশিষ্ট্য। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যে যেমন দেখি প্রবহমান জীবনের ছবি— সারিবদ্ধ সোপানে, এখানে নৃত্যরত চারটি স্তরে দেখি ইতিহাসেরই প্রবহমান ধারা। শেষ দৃশ্যে উপরের সারিতে চলে আসে সাধারণ মানুষের ভূতেরা। তারাই যেন পরিণতিতে 'সারভাইভ' করে, বাকিরা সব কালের বিচারে ইতিহাসের চরিত্র হয়ে যায়। নাচের দৃশ্যাবলিকে সামগ্রিকভাবে মিলিয়ে দেখলে এর আঙ্গিকে ও বিন্যাসে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প প্রকরণের এক আশ্চর্য সমন্বয়। এর ভারতীয় দিকটা হল ভূতের রূপে ও ধরনে, বাদ্যযন্ত্রে— সব ক'টিই দিশি বাদ্যযন্ত্র, রাগের ব্যবহারে ভারতীয় সংগীতের বোলে, নাচের ছন্দও ভারতীয় রীতিতে— ভরতনাট্যম ও লোকনৃত্যের ভঙ্গিতে।

পাশ্চাত্য প্রকরণ লক্ষ করি বিভিন্ন পর্বের উপস্থাপনায় ও পর্বভাগের বিন্যাসে। মোৎসার্টের অপেরার চারটি স্বর-সম্মিলনের মতো এখানে শুনি চারটি বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়। ভূতের নাচ চলে পাঁচটি পর্বে, প্রতিটি পর্বে চারটি অংশ, শেষ পর্বে সব অংশের সম্মিলন, একটি ফ্রেমে' পর্বভাগের মধ্যে লক্ষ করি পাশ্চাত্য সংগীতের 'সোনাটা' ফর্মের উপমা. int-oduction থেকে exposition-devolopment-recapitulation বা culnination, সবশেষে coda. সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে

'মিউজিকটা যদি এমন একটা বেসিস থেকে ধরা যায়, এমন ফান্ডামেন্টাল থেকে, যেখানে আমি দিশি-বিলিতি একেবারে ইচ্ছেমতো মেশাতে পারি এবং মেশানো সত্ত্বেও সেটা এসেনশিয়্যালি মিউজিকই থেকে যায়।' এই সমন্বয়ে শিল্পরূপটি বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে ওঠে। সোনাটার সাদৃশ্যে গড়ে তোলা পর্ব-পর্বান্তর নাচের দৃশ্যগুলিতে এক নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে। চারটি ভিন্ন স্বরের বাদ্যের প্রয়োগে এই নাটকীয়তা গভীরতর হয়। দৃশ্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা পর্বভাগের বৈচিত্রে পাশ্চাত্য সংগীতের বিন্যাসকে পরিস্ফুট করবে।

প্রথম পর্ব (পর্দায় স্থায়িত্ব ১ মি ৪৫ সে)। প্রথম অংশ। নৃত্যরত ছ'টি মূর্তি পর্দায় ফুটে ওঠে একসঙ্গে। মৃদঙ্গের বোলে ও নাচের ছন্দে ধ্রুপদী মেজাজ। নৃত্যশৈলী ভরতনাট্যমের ঘরানায়। অঙ্গ সঞ্চালন, পোশাক, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্ধনী দেখে বোঝা যায় মূর্তিগুলি রাজা-বাদশার। জীবিতকালের রাজকীয় মহিমা আজও অটুট। নাচের ভঙ্গিতে তেজ ও বলিষ্ঠতাও লক্ষণীয়। মুখচ্ছবিতে ভৌতিক আবরণ। দ্বিতীয় অংশে চরিত্রগুলি আসে সারি করে ছন্দোবদ্ধভাবে পর্দার ডান পাশ থেকে। নাচে লোকনৃত্যের ভঙ্গি। এর সঙ্গে বাজে খঞ্জিরা। চরিত্রগুলির হাতে দেখি একতারা, লাঠি, বল্লম, কোমরে কাস্তে। খালি গা বা পোশাকের ধরনে এরা কেউ বাউল বা চাষা, বা লাঠিয়াল বা সাঁওতাল। তৃতীয় অংশে আসে সাহেব ভূতের দল, এরাও সংখ্যায় ছ'টি, তবে এদের পর্দায় এক-এক জায়গায় এক-এক জনকে উপস্থিত হতে দেখি। গায়ে বিলিতি পোশাক, মাথায় টুপি। হাবেভাবে উদ্ধত ও আড়ষ্ট। একজনের হাতে রিভলবার দেখা যায়, একজনের হাতে বোতল— সে নীলকর সাহেবের ভূত, একজনের হাতে ছড়ি— হাবেভাবে সে বেশ চালিয়াত। আর একজনের হাতে দেখি তলোয়ার— সে গোরা সৈনিকের ভূত। ভুঁইফোঁড়ের মতো আকস্মিকের চমক এদের চালচলনে। দাপটের ভাব প্রকট। আগের দুটি অংশের ছন্দোময় নাচের সঙ্গে প্রভেদ স্পষ্ট। এই দৃশ্যে বাজে ঘট্টম। তার কেঠো আওয়াজ চরিত্রগুলির কাটখোট্টা মেজাজের সঙ্গে মানানসই হয়ে যায়। এখানে নাচ বলে কিছু দেখি না, বাজনার তালে তালে এক একটা movement লক্ষ করা যায়। এরা দাঁড়িয়েও থাকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। চতুর্থ অংশে মোটা ভূতের দল আসে। আকৃতিতে অতিকায়। প্রথমটি উঠে আসে নীচ থেকে। পরেরগুলি পর্দায় বাঁ পাশ থেকে তিনটি ও ডান পাশ থেকে দুটি এসে উপস্থিত হয়। এখানে বাজে মুড়শৃং, বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদের যেন 'গুড়গুড়' করে আগমন ঘটে পর্দায়। মুড়শৃং-এর আওয়াজের কৌতুকময়তা আর এদের আকৃতি, পোশাক, চলাফেরার ধরনে হুতোমের নকশার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। পোশাক দেখে বোঝা যায় যে এদের একজন পাদ্রি, একজন টিকিওলা পুরুত

গায়ে নামাবলি, একজন হেডমাস্টার তার হাতে ছড়ি, একজন খোসমেজাজি ইয়ারবাবু কোঁচাটি তার হাতে, একজন বানিয়া তার মাথায় ছোট টুপি, অন্যজন শহুরে বাবু তার মাথায় উনবিংশ শতকের চলতি উষ্ণীষ। এরাও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে তবে মৃদু গতিতে চলাফেরা করে, বাজনার ছন্দে তাল মিলিয়ে। বোঝা যায় নড়াচড়ায় এদের শ্লথগতি শরীরের স্থূলত্বের জন্যই।

দ্বিতীয় পর্বে (পর্দায় স্থায়িত্ব ১ মি ২৫ সে) চারটি অংশই আবার ক্রমান্বয়ে ফিরে আসে। সব ক'টি অংশেই বাজনার লয় বেড়ে যায়, নাচের ঢংও সেই অনুযায়ী পাল্টায়। রাজা-ভূতের মূর্তিরা এক সময়ে পর্দা জুড়ে একটি একটি করে আসে, আবার সম্মিলিত ভাবে নাচে। ভরতনাট্যমের পূর্ণ মেজাজে। চাষি শ্রেণীর ভূতদেরও বাজনা ও নাচের গতি বৃদ্ধি পায়। চরিত্র ছ'টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে ৩ জন ৩ জন করে দু'লাইনে মুখোমুখি নাচে। সাহেব ভূতগুলি একে একে এক লাইনে এসে পরস্পরের সঙ্গে সাহেবি মেজাজে কুশল বিনিময় করে ও নিজেদের মধ্যে পরিচিত হয়। মোটা ভূতগুলিকেও এক লাইনে দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে শরীরকে আন্দোলিত করতে দেখা যায়। এ দৃশ্যে এদের চারিত্রিক ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট। প্রথম পর্বের আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে দ্বিতীয় পর্বে আমরা যেন একটু স্থিত হই। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি নিপুণ নৃত্যকলা, বিভিন্ন শ্রেণির ভূতের বিশেষত্ব। দ্বিতীয় পর্বটি যেন প্রথম পর্বেরই পরিণত অংশ।

তৃতীয় পর্ব (পর্দায় স্থায়িত্ব ১ মি ২০ সে)। বাজনার তাল ও লয় দ্রুত হয়ে ওঠে,নাচের ছন্দেও গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। রাজাদের নাচের কম্পোজিশন তৈরি হয় ক্যামেরার কারসাজিতে। নাচে কাঁধের সঞ্চালন (neck movment) লক্ষণীয়। ছ'টি চাষির নাচে ছ'রকম পার্থক্য দেখা যায়, যেন তারা তাদের identity বজায় রাখতে চাইছে। সাহেবরা সকলেই কমবেশি নাচছে। তবে দিশির চাইতে বিলিতি ঢংটাই বেশি। হঠাৎ একজন মোসাহেব শ্রেণির চরিত্র আলবোলা হাতে নিয়ে তোষামোদ করতে চাইছে, ঠেলা খেয়ে দ্রুত চলে যায়। মোটা ভূতের নাচের মধ্যে এক সময় পাদ্রি বাইবেল নিয়ে পুরুতকে কিছু বলতে চায়, পুরুত উপেক্ষা করে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। পাদ্রি তখন যায় অন্যের কাছে, বাইবেলখানা থেকে হয়তো কিছু বোঝানোর জন্য। বাবুশ্রেণির ভূতেরা নিজেদের নিয়েই মশগুল। নাচের ছন্দের মাত্রা বৃদ্ধিতে শিল্প-সুষমাটুকু ক্রমে লোপ পেতে থাকে। তৃতীয় পর্বে চার শ্রেণির ভূতের মধ্যেই যেন তাদের স্বভাব-চরিত্রের আদত চেহারাটা ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ পর্বে (পর্দায় স্থায়িত্ব ১ মি ৫ সে) বাজনার লয় অতি দ্রুত। নাচেও যেন ছটোপুটির ভাব। ছন্দ ও সুষমা পুরোপুরি লোপ পেয়ে মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে মিলিয়ে

আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মেজাজ। ক্যামেরার কারসাজিতে দৃশ্যগুলি খুবই নাটকীয়, তেজোদীপ্ত। চাষি শ্রেণীর ভূতদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। একে অপরকে আক্রমণ করছে হাতিয়ার দিয়ে। লাঠিয়াল তাড়া করছে মুসলমানকে, বাউলের সঙ্গে সাঁওতালের হাতাহাতি। একতারা উঁচিয়ে বাউল মারমুখী। সাহেব ভূতদের মধ্যে একটা মিলিটারি মেজাজ। কেউ আস্ফালন করছে, কেউ মার্চিং করছে, আরেকজন তলোয়ার ঘোরাচ্ছে, কেউ বন্দুক ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। সকলেরই একটু যেন টালমাটাল অবস্থা। মোটা ভূতেরা করছে শরীর নিয়ে গুঁতোগুঁতি। স্থূলত্বের জন্য একজন ভারসাম্য না রাখতে পেরে পড়ে যায়। হেডমাস্টার ছড়ি উঁচিয়ে গুরুগিরি ফলায়। পাদ্রি সব্বাইকে শান্ত হতে বলে। না পেরে আকাশের দিকে চেয়ে যেন যিশুকেই ডাকতে শুরু করে। এই পর্বে নাচের ঢং তাল ও লয় রূপ নেয় একটি বিশেষ দিকে— সেখানে যেন নাটক জমে ওঠে। হইহই করা কিছু একটা ঘটছে। আগের তিনটি পর্ব পেরিয়ে এসে ভূতেরা সকলে যেন ফিরে যায় জীবিতকালীন রিপু-প্রহারের অধীনে।

পঞ্চম পর্বে (পর্দায় স্থায়িত্ব ৫৫ সে) বাজনার লয় একেবারে তুঙ্গে। মারামারি হানাহানি চূড়ান্ত পর্যায়ে। রাজাদের হাতে অস্ত্র এসে যায়, সেই দিয়ে আক্রমণ। সব ক'টি অংশেই এই কোলাহল যুদ্ধ-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। একে একে সব ক'টিরই পতন। এই পর্বে যেন ভূত ও মানুষের ভেদ মুছে যায়। হানাহানি মারামারি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে মরণোত্তর প্রাণীও যেন সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাকেই প্রকট করে তোলে।

শেষ দৃশ্যে (স্থায়িত্ব ৫৫ সে) সব ক'টি অংশই আবার পুনর্জীবন লাভ করে একই ফ্রেমে সারিবদ্ধ হয়ে আবার নাচানাচি শুরু করে। এটি যেন উত্তরণের পর্ব। বিনাশের পরেও আসে নবজীবন। ভেদাভেদশূন্য সম্মিলন। পর্বে পর্বে এক-একটি ভাগের পর্দায় স্থায়িত্বের সময় কমে আসাও লক্ষণীয়। এতে পরিণতি বা culmination period তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ভূতের নাচের দৃশ্য আসে ছবি শুরু হবার বাইশ মিনিট পর। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে আমরা লক্ষ করি ভূতের নাচ *গু-গা-বা-বা* ছবির একটা সন্ধিক্ষণ। যে রূঢ় বাস্তব পরিবেশের মধ্য দিয়ে ছবির শুরু, তা যেন ভূতের নাচের শেষে পৌঁছে যায় এক আশ্চর্য রূপকথার জগতে। ছবির শুরু একটি ফ্রিজ শট দিয়ে, তানপুরা কাঁধে নিয়ে হাসিমুখে গুপী আসছে গ্রামের দিকে, মাঠের আলপথ দিয়ে। ছবিতে দ্বিতীয় ফ্রিজ শট আসে বাঘ দেখে ভয় পেয়ে গুপী-বাঘার পাথর হয়ে যাওয়ার দৃশ্যে। এই দুটি ফ্রিজ শট যেন অন্তবর্তীকালীন বাস্তবতাকে বন্ধনীভুক্ত করে কাহিনিকে নিয়ে

যায় রূপকথার জগতে। এই রূপকথা কী? রুশতী সেনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় 'যেখানে সবই সত্যি অথচ তার চেয়ে বড় স্বপ্ন আর নেই; যেখানে সবই স্বপ্ন অথচ তার থেকে বেশি সত্যি আর নেই।' এমনি করেই গুপী-বাঘার স্বপ্ন মেশে জীবনে, জীবন মেশে স্বপনে। তখন তাদের আমরা দেখি পরিবর্তিত রূপে, বুদ্ধিতে অনেক বেশি পরিণত, ব্যবহারে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। জন্মগত কুণ্ঠা আর আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তারা হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী।

এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে, *গু-গা-বা-বা*-তে কি ফ্যান্টাসির মোড়কে চিত্রিত হয় মানুষের ইচ্ছাপূরণের কাহিনি? না কি এটা না-খেতে-পাওয়া শোষিত মানুষের হাহাকারের ছবি। বা, এই ভূতের নাচের দৃশ্যটির থেকে শুরু করে ছবির পরবর্তী অংশ জুড়ে এক যুদ্ধ-বিরোধী বার্তাকেই স্পষ্ট করে তোলে। আমরা মনে মনে তর্ক করি ভূতের রাজা কি গুপী-বাঘাকে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য ভূতের নাচ দেখাতে চেয়েছিল? না কি, আমাদের মধ্যে যে আত্মহননকারী হিংসাপ্রবৃত্তি রক্তবীজের মতো জীবনে বা মরণোত্তর কালেও মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এবং তা যে পরিণতিতে সমগ্র মানবকুলকে নিছক ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, সেই বার্তাটিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য? ভূতের নাচের দৃশ্য নিঃসন্দেহে গুপী-বাঘাকে আলোড়িত করে, সচেতনতায় অভিজ্ঞ করে। তাই এই ভূতের নাচ দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই তারা যুধ্যমান হাল্লার সৈন্যদের বলে 'তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?'

ভূতের রাজার বরের জোরে গুপী-বাঘা আসে শুন্ডি দেশে। সেখানে 'গাছে ফল আছে, ফুল আছে, পাখি আছে, দেশে শান্তি আছে, হাসি আছে।' সে দেশের রাজামশাইয়ের জাঁকজমকের নাইকো বালাই। কিন্তু তার একটাই দুশ্চিন্তার কারণ— তিন দিনের মধ্যে আত্মসমর্পন না করলে হাল্লার রাজা সসৈন্য এসে এ দেশ দখল করে নেবে।। গুপী-বাঘা তাকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্যত হয়। হাল্লার রাজ্যে গিয়ে তারা শোনে ষড়যন্ত্রী মন্ত্রীর কথা 'দেশের লোক যা চায় সেটা যদি না বলে তা হলে তাদের সেটা পাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া যায় কি?' দেখে, না-খেতে-পাওয়া নিপীড়িত মানুষের মিছিল, খরার সময় ঠিক মতো খাজনা দিতে না পারায় বন্দি হয়ে চলেছে জেলখানার ভেতর। দেশে সর্বত্রই যখন দুর্ভিক্ষের ছাপ, তার মধ্যে চলে পররাজ্য আক্রমণের অভিসন্ধি, যুদ্ধের প্রস্তুতি।

বরের জোরে বলীয়ন গুপী-বাঘা এই আসন্ন বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে কী করে, তা বোঝার জন্য আমাদের বরদানের বিষয়টিকে একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ভূতের রাজা খুশি হয়ে গুপী-বাঘাকে তিনটে বর দিতে চায়। গ্রামের মান্যগণ্য প্রবীণ মানুষদের কুপরামর্শ ও রক্ষাকর্তা রাজার কাছ থেকে অপমান ও নির্বাসনের

আদেশ পেয়ে ঘর ছাড়া গুপী-বাঘার আশু সমস্যাটি হল গ্রাসাচ্ছাদনের। তাই প্রথম বরে এই সমস্যাটাকে মিটিয়ে নিতে চাইল। পরের বর দুটি চাওয়ার মধ্যে গুপী-বাঘার মনের সাধ মেটানোর ইচ্ছেটা প্রকাশ পায়। তারা লোভীর মতো ধনদৌলত ভোগ বিলাস চায় না। চায়, কূপমণ্ডূকতার বেড়া ছাড়িয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে আর একজন সার্থক শিল্পীর মতো গানবাজনা করে সকলকে খুশি করতে। এই প্রার্থনা দুটিতে গুপী-বাঘা নিতান্ত সাধারণ মানুষ হয়েও কোথায় যেন আলাদা। ভূতের রাজার বর আর বরাভয় তাদের সামনের জীবনযুদ্ধে সাহস দেয়।

ভূতের রাজার বরের জোরে গুপীবাঘা গানবাজনা করে শ্রোতাদের কেবল খুশিই করে না, 'ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে' চলচ্ছক্তিহীন করে দিতে পারে। বাস্তব জীবনে যাদের কাছে অপমান, লাঞ্ছনা আর পীড়নই পেয়ে এসেছে এত দিন, তাদের সমগোত্রীয়রা আজ ভৌতিক বরের জোরে স্তব্ধ। চক্রান্তকারীকে গুপী-বাঘা বলে, 'ও মন্ত্রী মশাই ষড়যন্ত্রী মশাই, থেমে যাক।' ভূতের নাচের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গুপী-বাঘা ভূতের রাজার দেওয়া বরকে ব্যবহার করে শক্তিশেলের মতো। ঘোষণা করে যুদ্ধবিরোধী বার্তা, 'রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল।'

ইতিহাসের গতিপথে বহু দেশই ভাগ হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলে নজরে পড়ে বিভক্ত দেশগুলির মুখ কিন্তু একই রকম। কোনও বিশেষ শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক আবরণে এই দেশ ভাগ। হাল্লা ও শুন্ডির মিলনও একটাই মুখকে জোড়া দেওয়া। একই হৃদয়, একই ভাষা, একই নদী, একই আকাশ, অথচ দুটি পৃথক দেশ। অসহনীয় এই পরিস্থিতির সমাধানের জন্য মিলন-বার্তাই হল শুন্ডির-হাল্লার দেশের লোকের অন্তরের কথা। এই দেশ দুটির মিলন মুহূর্তে গুপী-বাঘার সঙ্গে রাজকন্যাদের বিয়ে হয়, ছেলেবেলার সাধ ছড়িয়ে পড়ে পরিণত বয়সের ইচ্ছাপূরণে। হতমান, দীনদরিদ্র, নিতান্ত তাচ্ছিল্যের দুটি মানুষ বরপ্রাপ্তিতে হয়ে ওঠে অসামান্য, অসাধারণ। ভূতের সংস্পর্শ তাদের জীবনের এক স্বর্ণমুহূর্ত। গানে গানে শান্তির বাণী শোনাতে শোনাতে নিশ্চয়ই গুপী-বাঘার মনে পড়ছিল নিজেদের মধ্যে লড়তে-লড়তে ভূতদের ধুপধাপ পড়ে যাওয়ার ধ্বনি, চিত্র এবং বিন্যাস।

নাচটা হচ্ছে আসলে ভূতের দল। প্রত্যেক দলের

ভূতের চার শ্রেণী আছে — ১) ক্ষত্রিয় ২) ব্রাহ্মণ ৩) বৈশ্য ৪) শূদ্র।

প্রত্যেকটি শ্রেণী ৬ জন করে নাচিয়ে নাচবে। মোট ২৪ জন নাচিয়ে

থাকবে দলে। ৬০ সেকেন্ডের ৭টা [illegible] [illegible] [illegible]

চারটে ভাগ —

SECTION 1

১) ক্ষত্রিয় (রাজা) — [illegible] নাচ — classical নাচ। [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২) ব্রাহ্মণ ([illegible]) — [illegible] [illegible] [illegible] — ও folk নাচ।

৩। বৈশ্য (সাহেব) — [illegible] [illegible] officer [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] movement [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] level-এ [illegible] [illegible]।

৪। শূদ্র (চাষী) — [illegible] [illegible] 'হুঁ হুঁ' [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] movement limited — [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] Section-এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[SECTION 2]

১) মুদ্রা (রাজা) – music অনুযায়ী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]

২) [illegible] (চাষা) – ~~[illegible]~~ – [illegible] [illegible] [illegible]

৩) ভঙ্গি (সাহেব) – [illegible] [illegible] level [illegible] [illegible] level [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] movement [illegible] [illegible] [illegible]।

৪) [illegible] ([illegible]) – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

খেরোর খাতা। গু-গা-বা-বা: ভূতের নাচ (২)

[SECTION 3]

১) [illegible] ([illegible]) — classical এ [illegible] । [illegible] camera composition এ [illegible] — [illegible] composition এ [illegible] [illegible] ।

২. [illegible] ([illegible]) — এদের হাতে [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] — [illegible] identity [illegible] [illegible] ।

৩) [illegible] ([illegible]) — [illegible] [illegible] । [illegible]

৪) [illegible] ([illegible]) — [illegible] । [illegible]

SECTION 4

১। [illegible] ([illegible]) — [illegible] Camera [illegible] Composition's [illegible]।

২। [illegible] ([illegible]) — [illegible]।

৩। [illegible] ([illegible]) — [illegible] Military [illegible]। [illegible] Marching [illegible] ([illegible])। [illegible]। [illegible]।

৪। [illegible] ([illegible]) — [illegible]। [illegible]। [illegible]। [illegible]। [illegible] —

SECTION 5

১।
২।
৩।
৪।

যুদ্ধ, ভোজন, যুদ্ধ, [illegible], খুন, ধ্বংসের
আয়োজন, উচ্ছ্বাসে এবং সব সমাপ্ত হয়।

SECTION 6

১।
২।
৩।
৪।

মানুষের সব সব দুর্বিষহ লোভ মায়া ভেঙ্গে।

SECTION 7 (climax)

২৪ বার এখানে সবাই চাং নাচে ~~[illegible]~~
তাল হাঃ। সাহেবগুলি পাশাপাশি নাচ — বিলাস নাচ।
(তাং হাত দুচক্র)

একটি চিত্রনাট্যের খসড়া: পরশপাথর

১৯৫৭। *জলসাঘর* ছবির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। মুখ্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস। হঠাৎ, *কাবুলিওয়ালা* ছবির সুবাদে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার জন্য। ছবি বিশ্বাস ছুটি নিয়ে চলে গেলেন। *জলসাঘর* ছবির কাজ স্থগিত। সত্যজিৎ রায় লিখছেন— 'ফলে যা অবস্থা দাঁড়াল, তা আমাকে দমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।' তাঁর নতুন বিষয় নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ইচ্ছে বরাবরের। একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে না থেকে ঠিক করলেন এই ফাঁকে একটা কমেডি ছবি করবেন। *পরশপাথর* গল্পটি তাঁর পড়াই ছিল, হাতের কাছে অভিনেতাও মজুত। তাঁর মতে, আকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের হাস্যরসবোধ বা কমিক সেন্স ও দুর্দান্ত অভিনয়-ক্ষমতা থাকলে তবেই তুলসী চক্রবর্তীর মতো কমেডিয়ান হওয়া যায়। শুরু হল চিত্রনাট্য লেখা। তারিখটা ১৫ জুন, ১৯৫৭।

পরশপাথর গল্পটি লেখা হয় ১৯৪৮-এ। গল্পে পরেশবাবু মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক লোক। পেশায় উকিল। হঠাৎ তিনি একদিন কোনওভাবে (গল্পে তার কোনও বিবরণ নেই) একটি পাথর কুড়িয়ে পান। সেটিকে পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। পরের দিন এর আশ্চর্য গুণ দেখে বোঝেন, এটি 'পরশপাথর'। পরখ করার জন্য ইতিমধ্যে ছুরি, কাঁচি, সীসের কাগজ-চাপা, ঘড়ি— সব সোনা করে ফেলেছেন। এ সব দেখে-বুঝে প্রথমে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। পরে ভাবলেন মা কালী তাঁকে নিয়ে লীলা খেলছেন, বা তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ঘোর কাটার পর নিজে প্রকৃতিস্থ হয়ে ও এই

অভাবনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে ভাবতে লাগলেন এ অবস্থায় তাঁর কী কী করণীয়। ক্রমে লোভের মাত্রা চড়িয়ে শুরু করলেন লোহাকে সোনা করার কারবার। বাজারে হঠাৎ অঢেল সোনা এসে পড়ায় দেশে-বিদেশে, শেয়ার বাজারে, অর্থনীতিতে সব জায়গায় হুলস্থুল কাণ্ড। বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রনেতা, দেশের সরকার, পুলিশ— সকলের একেবারে দিশেহারা অবস্থা। একটাই প্রশ্ন— এ সমস্যার সামাল দেওয়া যায় কী করে? এদিকে পরেশবাবু বে-পরোয়াভাবে তাঁর কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। কারখানার জন্য তিনি বহাল করেছেন প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে। প্রিয়তোষ অতি ভাল ছেলে, কারও সঙ্গে মেশে না, কোনও বিষয়ে কৌতূহল নেই, কখনও জানতে চায় না এত সোনা আসে কোথা থেকে। পরেশবাবুর মতে তাঁর দুটি রত্ন, একটি পাথর, অন্যটি প্রিয়তোষ। ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়তোষ একটি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার উদ্দেশে সে বড় বড় কবিতা আর প্রেমপত্র লেখে। অথচ প্রেমিকা হিন্দোলা তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে, আড়ালে সে গুঞ্জন ঘোষের সঙ্গে মেতে আছে। একদিন প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানের পর নিদারুণ মনোভঙ্গে প্রিয়তোষ পাথরটি গিলে করতে চায় আত্মহত্যা। পরেশবাবুর মারফত হিন্দোলার বাবা এই ঘটনা শুনে অতি তৎপর হয়ে এমন একটি 'হিরণ্যগর্ভ' পাত্রের সঙ্গে প্রায় জোরাজুরি করেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। আর পাথরটিকে পেট থেকে বার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পাথরকে পেট চিরে বার করা যায় না। এক অভূতপূর্ব মেটাবলিজমে প্রিয়তোষ সেটিকে আস্তে আস্তে হজম করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যাওয়া তাবৎ লোহা আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে আসে। পাথর হজম করে প্রিয়তোষ মনে বল পায়, এর পর সে আর বউ ও শ্বশুরের বাক্যবাণে বিচলিত হয় না। পরেশবাবুও নিশ্চিন্তে সোনা ছেড়ে লোহার কারবার চালিয়ে মহাফূর্তিতে দিন কাটান।

এই নিছক রঙ্গতামাশার গল্পটি কীভাবে ছবিতে একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনে দুঃখ-গ্লানি, হতাশা-বঞ্চনা ও পরবর্তী জীবনে সুখের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে লোভের ফাঁদে পড়া, তার পর হাঁপিয়ে ওঠা বড়লোকি জীবন থেকে পালিয়ে সাধারণের মতো বাঁচার মধ্যেই মুক্তি খুঁজে পাওয়ার কাহিনি হয়ে ওঠে— সে বিষয়ে খেরোর খাতায় খসড়া লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখলেই পরিচালকের ভাবনাচিন্তার গতি-প্রকৃতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

•

মুক্তির তালিকা অনুয়ায়ী *পরশপাথর* সত্যজিৎ রায়ের তিন নম্বর ছবি। চিত্রনাট্য লেখার দিকে থেকে চার নম্বর। *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত* ছবির চিত্রনাট্য লেখায়

বিভূতিভূষণের উপন্যাস তাঁকে অনেকটাই সাহায্য করেছে। তিনিও স্বীকার করেছেন 'কোন একজন সাহিত্যিকের নাম নির্দ্বিধায় করতে পারি। তিনি হলেন স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনায় এত বড় গুরু আর কেউ নেই। বিভূতিভূষণের সংলাপ পড়লে মনে হয় যেন সরাসরি লোকের মুখ থেকে কথা তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিয়েছেন। এ-সংলাপ এতই চরিত্রোপযোগী, এতই revealing যে, লেখক নিজে আকৃতির কোন বর্ণনা না দিলেও কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের চেহারাটি যেন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি না থাকলে এ ধরনের সংলাপ সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য চিত্রনাট্য রচয়িতার পক্ষে এ দুটি গুণ অপরিহার্য।' তাই *জলসাঘর* প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, যেটি তিনি সম্পূর্ণই নিজে লিখেছেন। *পরশপাথর* চিত্রনাট্যটি তার পরের রচনা।

চিত্রনাট্য লেখার সময় তিনি ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে খুবই সচেতন। যে কথাগুলি ছবির সংলাপে আসে স্বচ্ছন্দভাবে, স্বাভাবিক টানে সেই সহজ কথাটি বের করে আনতে তিনি যে কতটা যত্নবান, খেরোর খাতায় লেখা-কাটাকুটি-আবার নতুন করে লেখাই তার প্রমাণ। এই কাটাকুটি ও সংশোধনের পরিমাণ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। এক-একটি দৃশ্য প্রায় আট-দশবার করে লেখা। ক্রমশ তাতে কথা পাল্টাচ্ছে, কথায় নতুন শব্দ ঢুকছে। ছবির দৃশ্যগুলি সংলাপের মাধ্যমে আরও আঁটোসাটো হচ্ছে। তিনি চাইতেন, বক্তব্যকে সরাসরি কথায় না বলে সেটা যতটা সম্ভব আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করা। গল্প-উপন্যাসে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে কাজ হয়। ছবি দিয়ে যেটুকু বলা সম্ভব হল না, সংলাপে কেবল সেটুকু বলা। অতিকথন বা কথায় চটকদারি মেজাজ ছবির পক্ষে নিতান্তই বেমানান। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ দিয়ে একটি কথায় দৃশ্যকে দেখার সম্ভাব্য সহস্র বিকল্পের থেকে একটিকে বাছাই করার সময় যে-সচেতন মন কাজ করে, কথাকেও নানা ভাবে বলার উপায় থেকে সঠিক বাক্যটিকে বের করে আনার জন্য থাকে সেই সচেতনতা। যাতে পরিমিতি বোধের মাত্রায় চরিত্র, পরিবেশ, পূর্বাপর ঘটনাক্রম এক স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। দু'একটি শব্দে অনেক কথাকে প্রকাশ করতে পারলে শব্দগুলিও স্ফুলিঙ্গের চেহারা নেয়।

*

খেরোর খাতায় *পরশপাথর*-এর পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য লেখার আগে প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে গল্পের ঘটনাবিন্যাসকে ছবি তৈরির উপযুক্ত করে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য দুটি খসড়া লেখা আমাদের চোখে পড়ে। চিত্রনাট্যকে যদি ছবির কাঠামো হিসেবে গণ্য করা হয়,

তা হলে এই খসড়া লেখাগুলিকে বলা যায় চিত্রনাট্যের কাঠামো। প্রথম খসড়াটি অনেকটাই মূল গল্পের অনুসরণে লেখা। এই কাঠামোটিকে লিখিত অবস্থায় চোখের সামনে রেখে সত্যজিৎ রায় ছবির জন্য চিত্রনাট্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, দৃশ্য নিয়ে পরিকল্পনা, চরিত্রের ধরন-ধারণ ও তাদের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ কোনও জায়গায় দু'একটি কথায়, কোথাও বা বিশদভাবে— আবার কোথাও কোনও একটি দৃশ্য ছবিতে দেখানোর কী কারণ থাকতে পারে বা কোনও কারণ আছে কি না— সে সব কথা প্রশ্নের আকারে লিখে রেখেছেন এই খেরোর খাতায় পাতার পর পাতা জুড়ে। এ সব টুকিটাকি মন্তব্য নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত, যেন নিজের কাছে ভাবনা-চিন্তাগুলিকে যাচাই করে নেওয়া, সেই সঙ্গে পরিবেশ, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত করে তোলার প্রক্রিয়া। তিনি বলেছেন, প্রতিটি দৃশ্য, কথা বা ঘটনার পেছনে একটা অনিবার্য ও বাস্তবসম্মত কারণ থাকা দরকার। এই সংযম ও পরিমিতিবোধ ছবিকে করে তোলে ঘনসংবদ্ধ ও ব্যঞ্জনাময়।

যে কোনও ছবি শুরু হওয়ার দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই প্রধান চরিত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিত, সামাজিক অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। দর্শকের কাছে শুরুর এই দশ-বারো মিনিটটা খুবই জরুরি। এ সময়ে পরিবেশিত তথ্য পরবর্তী সময়ের ঘটনা বা চরিত্রের আচার-আচরণকে বোঝার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ছবির চিত্রনাট্য তৈরির আগে তিনি লিখেছেন 'পাথরটা পেয়ে পরেশের যে পরিবর্তন হোল সেটা ফুটিয়ে তুলতে গেলে পাথরটা পাবার আগে অবস্থাটা একটু দেখানো দরকার... পাথরটা পেয়ে যাবার আগে পরেশকে একটু establish করা দরকার। যেদিন বিকেলে পাথরটা পেল সেদিন সকালবেলাটা পরেশকে বাড়িতে দেখানো যেতে পারে— পরেশ কি রকম লোক— তার পাড়াপড়শীরা কেমন— গিরিবালা কেমন— সবগুলো এই সকালের দৃশ্যে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।' ছবিতে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে দিনকার সকালবেলার কোনও দৃশ্য না থাকলেও, প্রথম দৃশ্যের নেপথ্য বিবরণী, পরেশের অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা, বাড়ির গলি, স্ত্রী গিরিবালার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে পরেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত।

এর পর পরের খসড়াটিতে, সেটি ইংরেজিতে লেখা, তিনি ঘটনা-বিন্যাসকে চিত্রনাট্যের মতো পর্ব ভাগ করে সাজিয়ে নিয়েছেন। লেখাটিতে সাতটি পর্ব ভাগ আছে। বেশ কিছু সংলাপও চোখে পড়ে। প্রথম লেখাটি থেকে দ্বিতীয়টিতে ঘটনা ও দৃশ্য অনেকটা পালটে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, খেরোর খাতায় লেখা টুকরোটাকরা মন্তব্যের মধ্যে যে ভাবনাচিন্তাগুলি ছিল সে সব একটা নির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছে। এই

পরিবর্তন চলেছে পর্বে পর্বে। দুটি খসড়া-কাঠামোকে ভিত্তি করে যে চিত্রনাট্য লেখা হয়, তাতে মাজাঘষা করতে করতে আসে শুটিং স্ক্রিপ্ট। শুটিং স্ক্রিপ্টের পর পরিবর্তন হয় সামান্যই। অভিনেতা-অভিনেত্রীর বলার ধরন, উচ্চারণের ভঙ্গি, অভিনয় করার ক্ষমতা দেখে কথার দু'-একটা শব্দ পাল্টানো হয়।

চিত্রনাট্য লেখার জন্য প্রথম খসড়ায় ঘটনা-বিন্যাসকে তিনি সাজিয়েছিলেন এইভাবে:

'পরেশবাবু মাঝবয়সী কেরানি (উকিল?)। আয় কম, কোনরকমে সংসার চলে।' পরেশের পেশাকে উকিল থেকে কেরানিতে পালটে দেওয়া হয়। কেরানি বলতে একটি বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই বোঝায়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কেরানিদের কাজের ধরন, মাইনের বৈষম্য ও সামাজিক অবস্থান তাদের মানসিকতায় গড়ে তোলে এক আত্মগ্লানি ও হীনমন্যতার বোধ। অন্য দিকে কর্মক্ষেত্রে অধীনতা ও সামাজিক জীবনে বঞ্চনাকে কাটিয়ে, সীমিত পরিসরে হলেও আধিপত্য দেখানোর এক সুপ্ত অথচ নিষ্ফল বাসনা তাদের চরিত্রকে করে তোলে বহুমাত্রিক। *'স্ত্রী গিরিবালা নিঃসন্তান।'* গল্পে পরেশের একটি ছেলে ছিল, যাকে সে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা খেলনা হিসেবে দেবে। ছবিতে সে পাথরটা প্রতিবেশীর ছেলেকে দেয়। নিঃসন্তান হবার ফলে, উত্তরাধিকারের জন্য সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থাকে না— তাই অর্থকরী ভাবনা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। *'শ্যামবাজারের একটি বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর নিয়ে তারা থাকে। পাড়াপড়শীরা সকলেই পরেশকে ভালবাসে— কারণ পরেশ সরল, পরোপকারী, সৎ লোক। কারো কোনো অনিষ্ট করেনি কোনদিন।'*

'একদিন বর্ষাকালে Dalhousie Square-এ ট্রাম থেকে নেমে পরেশ অফিসের দিকে যাচ্ছে এমন সময় একটি গাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে কাপড় বদলিয়ে অফিস পৌঁছতে পৌঁছতে পরেশ দেড় ঘণ্টা late হয়ে যায়। বড় সাহেব পূর্বে late হবার জন্য পরেশকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এবার বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পরেশকে dismiss করেন'।

ছবিটির ঘটনাবলি যে সময়ের, তখন ব্যাঙ্কে বা সওদাগরি অফিসে কর্তৃপক্ষের এ রকম উদ্ধত আস্ফালন বিরল ঘটনা নয়, তবুও আরও কালোপযোগী করার জন্য সত্যজিৎ রায় ছবিতে চাকরি থেকে সরাসরি বরখাস্ত না করিয়ে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ও ইউনিয়নের মিটিং-এর প্রসঙ্গ আনেন। এমনকী চিত্রনাট্যের প্রথম দিককার খসড়ায় পরেশের এক সহকর্মীর মুখে 'তা আপনাদের union তো খুব strong। বেশ করে ধোলাই দিন না' ধরনের জঙ্গি কথাবার্তার কথাও ভাবা হয়েছিল। *'বিষণ্ণ মনে অপিস থেকে বেরিয়ে পরেশ Curzon Park-এর ছোট্ট গম্বুজওয়ালা ঘরটিতে গিয়ে বসে।*

বৃষ্টি আসে। শিলাবৃষ্টি। পরেশ ঝিমিয়ে পড়ে। শিলের সঙ্গে একটি নুড়ি পাথর তার পায়ের কাছে এসে পড়ে। বৃষ্টি থামলে পর পরেশ সেটি লক্ষ্য করে। অন্যমনস্কভাবে সেটিকে পকেটস্থ করে পরেশ সেটা বাড়িতে নিয়ে আসে। স্ত্রীকে দুঃসংবাদ জানায়।'

গল্পে পরশপাথটি কীভাবে পরেশের হাতে এল তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ছবির পক্ষে এই তথ্য অত্যন্ত জরুরি। সত্যজিৎ রায় এ জন্য প্রথম থেকেই বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টি-শিলের সঙ্গে আকাশ থেকে টুপ করে নতুন ধরনের গোল কালো রঙের পাথর পড়া, আর এ বস্তুটিকে প্রথমাবস্থায় গুরুত্বহীন করে রাখার (বা দেখানোর) কথা ভেবেছেন।

প্রথম খসড়াতে ছবির শুরু কীভাবে হবে তারও কোনও ইঙ্গিত নেই। দ্বিতীয় খসড়াতে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে দেখা যায়, ছবি শুরু হবে GPO-র ঘড়ির দৃশ্য দিয়ে। বিকেল পাঁচটা বেজে তিন মিনিট। অফিস পাড়ায় কর্মচারীরা অফিস থেকে বের হতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটির জন্য ডালহৌসি স্কোয়ারের কোন বাড়ির ছাদে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলা হবে সে পরিকল্পনাও ঠিক হয়ে গেছে। এর পর ছবির বিষয়ভাবনা 'সত্যজিতের একটি কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'We concentrate on the lower income group'। এই ভাবনারই সম্প্রসারিত রূপ নিয়ে আসে ছবির শুরুর নেপথ্য বিবরণী, যার শেষাংশটা হল, '... বাঙলার কেরানি এঁরা... এঁদের দুর্ভাগ্য নিয়ে অনেক কাহিনি রচিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান কাহিনিও এঁদেরই একজনকে নিয়ে— এঁর নাম— শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত'।

প্রথম খসড়ার পরেশের বরখাস্ত হওয়ার ঘটনাটির পরিবর্তে দ্বিতীয় খসড়ায় দেখি— গুমোট দিন। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। আকাশে মেঘ গুড়গুড় করছে। পরেশ অফিস থেকে বের হয় হাতে ছাতা। ছবির lift-এর দৃশ্যটি এই খসড়ায় নেই। সেটি দেখি চিত্রনাট্যে। চিত্রনাট্যের প্রথম লেখায় ছিল 'পরেশ lift-এর ঘণ্টা টেপে। আরেকজন এসে দাঁড়াল— মিত্তির। (পরেশ) মুখে বিড়ি নিল। (হয়তো দোক্তার কথাও ভেবেছিলেন। পরে লেখেন 'দোকতার চেয়ে বিড়ি ভালো') lift এলে অফিসের বড় সাহেবরা গটগট করে তাতে ঢুকে পড়ে। পড়ে থাকে পরেশ ও মিত্তির। lift নেমে চলে গেলে পরেশের মুখে শুনি 'চাকুরিটাই যখন থাকছে না তখন lift আর হবে কোথায়? অ্যাঁ!' এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটা ছবিতে বাদ গেছে। বোধহয়, খুব obvious হয়ে যাবে ভেবে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় খসড়া অনুযায়ী, অফিস থেকে বেরিয়ে পরেশ অফিসের দেওয়ালে দেখে পোস্টার— ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সভা হবে আসছে-বুধবার। পরেশ তার অফিসের দু'-একজনের সঙ্গে এই মিটিং নিয়ে কথাবার্তার পর দ্রুত হেঁটে আসে বাড়ি ফেরার

জন্য ট্রাম-বাস ধরতে। পথে ভিখারি— পরেশ ভিক্ষা দেয়। ফুটপাতে হকার পশরা সাজিয়ে বসেছে। পরেশ পাশ কাটিয়ে আসে। দেখে গণৎকার— একজন দৈন্যদশাগ্রস্ত লোক হাত দেখাচ্ছে। পরেশ ভাবে, তার ভাগ্যটাও একবার যাচাই করে নেবে কি না। ছাঁটাইয়ের নোটিশে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভবিষ্যৎ। বাজ পড়ে। শতচ্ছিন্ন ছাতাটি খুলে সে চলে জোর কদমে। বৃষ্টি আসে মুষলধারে। শিলাবৃষ্টি। পরেশ দৌড়ে কার্জন পার্কে গম্বুজওয়ালা ঘরে আশ্রয় নেয়। শিলের সঙ্গে এক সময় একটা কালো নুড়ি পাথর পড়ে, তন্দ্রাচ্ছন্ন পরেশ ফুটবল মাঠ থেকে আসা 'গোল', 'গোল' চিৎকার শুনে সজাগ হয়। বৃষ্টিও ততক্ষণে থেমে গেছে। কালো পাথরটি তার নজরে আসে। সেটিকে পকেটস্থ করে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। ক্যামেরায় ধরা পড়বে গম্বুজের গায়ে কালো ফলকে লেখা 'A Good Name is more to be cherished than Great Riches'।

প্রথম খসড়া অনুযায়ী, বাড়ি ফিরে *'কিছুক্ষণ পরে সে পাথরের আশ্চর্য গুণ আবিষ্কার করে। স্ত্রীকে বলে। দুজনে স্থির করে এ পাথর ফেলে দেওয়া উচিৎ।'* এরই বিস্তারিত রূপ দেখি দ্বিতীয় খসড়ায়। সেখানে, দ্বিতীয় সিকোয়েন্সে পরেশকে দেখা যায় তার বাড়ির গলিতে। রাস্তায় বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ছাপ স্পষ্ট। তিনি তাঁর Notes-এ লিখছেন 'বৃষ্টি হয়ে যাবার পরের অবস্থা— প্রত্যেক শটে থাকবে।' কোনও বাড়ির রোয়াকে কোনও লোকজন নেই। সন্ধেবেলা। পাশের বাড়ির পলটু খেলনা নিয়ে খেলছে। সে পলটুকে ডাকে। তাকে পাথরটা দেয়। এই খসড়াতেও 'ব্রিঘাংচু' গল্পের চারলাইনের কবিতার কোনও উল্লেখ নেই। সেটা পাই চিত্রনাট্যের একেবারে প্রথম দিককার খসড়াতেই। অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টি দিয়ে লেখা কবিতাটির একটি দশ লাইনের সংস্করণ সুকুমার রায় 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকে বৃহস্পতির মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ছবিতে পরেশ এটিকে লোহাকে সোনা করার মন্ত্র হিসেবে কাচালুকে তামাশা করে বলে। কবিতাটির প্রয়োগ যেন ছবির পরবর্তী অসম্ভব আজগুবি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়।

এখানে পরেশকে পলটু ডাকে 'দাদু' বলে, ছবিতে এই সম্বোধন পালটানো হয়েছিল। পরেশের পরবর্তী কার্যকলাপের কথা মাথায় রেখে 'জ্যাঠামশাই' ডাকে সম্পর্কের ও বয়সের ফারাকটা হয়তো পরিচালক কমিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে গিরিবালার সঙ্গে কথাবার্তায় পরেশের অফিসের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানা যায়। ভজুকেও দেখা যায়। ইতিমধ্যে, পাথরটা নিয়ে খেলতে গিয়ে এর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা পলটুর চোখে পড়ে। উত্তেজনায় সে দৌড়ে আসে দাদুর কাছে। বলে, খেলনা পল্টনটার গায়ে পাথরটা ছোঁয়ানো মাত্র রং পালটে

গেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর Notes-এ লিখেছেন 'পলটুর খেলনা যেখানে থাকে সে জায়গাটাও establish করা উচিৎ।' ঘটনাচক্রে, পরবর্তী সময়ে, পরশপাথর উবে যাওয়ার পর পলটুর খেলনা রাখার জায়গার দৃশ্যাটি ছবিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পলটু আর একটা পল্টন হাতে নিয়ে আসে জ্যাঠামশাইকে পাথরের ভেলকি দেখানোর জন্য। (সত্যজিৎ রায় Notes-এ লিখেছেন পলটু যখন soldier টাকে মারবে তখন marble-এর মত করে মারবে— তাহ'লে টিপ করতে সুবিধা হবে)। পলটু বলে, ম্যাজিক পাথর। পরেশ বুঝতে পারে এর রহস্য। সে পাথরটা ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পলটু দেয় না। ওকে ভোলানোর জন্য পরেশ ফন্দি আঁটে। প্রথম খসড়ায় দোকানে গিয়ে সে পলটুর জন্য পছন্দসই বারোটা মার্বেল কেনে। ছবিতে দোকানে পৌঁছে পরেশের উদ্বেগের যে ছটফটানি দেখি, সেটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী সংযোজন। খেলনার বিনিময়ে পলটু পরেশকে পাথরটা ফেরত দেয়। এই খসড়াতে লেখা আছে, পাঁথরটা পরেশকে ফেরত দেওয়ার সময় পলটু সাবধান করে দেয় 'But do not tell the secret to anybody'। ছবিতে এ কথা পালটে হয়েছে 'এটা কাউকে দিও না কিন্তু, জ্যাঠামশাই'।

পরেশ যখন বুঝতে পারে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, তখন সেটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। আর যে ভাবে কৌশল করে সেটিকে হস্তগত করে, সেটা পলটুকে ঠকানোর পর্যায়েই পড়ে। আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় যখন চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়ায় দেখি, পরেশ পাথরটা ফেরত চাইলে পলটু বলে 'এটা ত তুমি আমাকে দিয়েই দিয়েছ।' সরল বালকের কাছে জ্যাঠামশাইয়ের এই অসঙ্গত আচরণ খুব বেমানান লাগে। চিত্রনাট্যের ওই খসড়ায় আরও দেখি, কাচালুর বাড়ির ককটেল পার্টির পরের দিন পরেশ অনুশোচনা করে প্রিয়তোষকে বলে, 'তারপর যখন ওটার গুণ জানতে পারলুম— ছেলেটির কাছ থেকে ঘুষ দিয়ে পাথরটি আদায় করলুম।' যদিও এই সংলাপ দুটিই মূল ছবি থেকে বাদ পড়ে গেছে, তবুও সত্যজিতের ভাবনায় পরেশের ঠকানোর মনোভাবটাই স্পষ্ট হয়ে যায়। বঞ্চিত সহজ মানুষটি লোভের তাড়নায় মনের সরলতা মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে। কুড়িয়ে পাওয়া ছোট নুড়ি পাথরটা যে আসলে একটা পরশপাথর, পরিচালক এ বার্তাটি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন একটি বালক মারফত। পরবর্তী ঘটনাচক্রে পলটুর বালকোচিত সারল্যের সঙ্গে পোড়খাওয়া বয়স্ক পরেশের চরিত্রের সরলতা আমাদের কাছে এক তুল্যমূল্য বিচারের বিষয় হয়ে ওঠে।

পলটুর কাছে পাথরটা একটা ম্যাজিক-পাথর। পরেশও জানে পরশ-পাথরের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। 'এ হয় না, হতে পারে না।' অথচ চোখের সামনে পাথরটির

অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তার মনের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমা পার হয়ে যায়। আসলে ম্যাজিক তো এক অর্থে লোক ঠকানো ক্রিয়াকৌশল। ছবিতে সব ক'টি লোভী মানুষকেই এই ম্যাজিক-পাথরের আবির্ভাব ও বিলীন হয়ে যাওয়ায় অন্তর্বর্তী সময়ে ভেলকিবাজির ক্ষণস্থায়ী চমকের প্রতি লোলুপ আকর্ষণের পরিণাম হিসেবে ঠকে যাওয়ার মতো অপ্রস্তুত ও হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

পাথরটা ফেরত পেয়ে পরেশ বাড়ি আসে সেটাকে নিজের হাতে পরখ করার জন্য। Notes-এ সত্যজিৎ লিখেছেন 'ঘরের জানালাগুলো বন্ধ থাকা উচিত'। চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়ায় আমরা দেখতে পাই যে পরেশ ফিরে এসে বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় বাইরের থেকে ডাক শোনে সদানন্দ চাটুজ্জে নামে এক অপরিচিতের। (সত্যজিৎ একবার ভেবেছিলেন লোকটি পরিচিতও হতে পারে, সংলাপও সেভাবে তৈরি করেছিলেন) দৃশ্যটি এই রকম।

সদা : নিবারণ বাড়িতে আছ?
পরেশ : নিবারণ? এ বাড়িতে নিবারণ কেউ নেই—
সদা : নিবারণ নেই?
পরেশ : আজ্ঞে না—
সদা : বেরিয়ে গেছে?
পরেশ : নিবারণ বলে এ বাড়িতে কেউ থাকে না।
সদা : এ বাড়িতে না?
পরেশ : আপনি নিবারণ ঘোষের বাড়ি খুঁজছেন—
সদা : হ্যাঁ, ওই ঝামাপুকুর পোস্টাফিস—
পরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ— ওই তিনটে বাড়ির পর ডান হাতি-তেত্রিশের বি।
সদা : ও, ঠিক এই রকমই যেন।

মনে হয়, পাথরটা হাতে পেয়ে পরেশের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্বেগ দেখানোর জন্যই হয়তো এ রকম একটি দৃশ্যের কথা সত্যজিৎ ভেবেছিলেন। পরেশ পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই এই মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে চাইছে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পাথরটাকে পরখ করার জন্য। অন্য দিকে, এই দৃশ্যে পরেশের পরোপকারী দিকটাও ফুটে ওঠে। মনের উদ্বেগের জন্য প্রথমে না বুঝলেও যখনই খেয়াল হয় এই লোকটি প্রতিবেশী নিবারণ ঘোষকেও খুঁজতে পারে, তক্ষুনি আগন্তুককে সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেয়। যাই হোক, পরিচালকের পরবর্তী ভাবনায় এই দৃশ্যটি ছবি থেকে বাদ পড়ে।

এর পর, পরেশ বন্ধ ঘরে তার জর্দার কৌটো, চশমার খাপ, পেপার ওয়েট, জাঁতি সব সোনা করে ফেলে। দ্বিতীয় খসড়ায় দেখি, চোখের সামনে এত সোনার জিনিস দেখে 'Paresh is gripped by a fear— fear (awe) of the supernatural. I do not deserve such luck. What have I done to deserve it? I must dispose of it– throw it in the Ganges.' পরেশের ছা-পোষা জীবনে এই অলৌকিক সৌভাগ্য আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় তাঁর Notes-এ লিখছেন 'পরশপাথরটা পেয়ে এবং তার implicatons টা realise করে পরেশ ভেউভেউ করে কাঁদতে থাকে। তার দেখাদেখি গিরিবালাও কাঁদে।' Notes-এ এক জায়গায় লেখা আছে 'ডান চোখ নাচছে/বাঁ হাত চুলকোচ্ছে'। সুদিন-দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ এই বাংলা প্রবাদ দুটি গিরিবালার সংলাপে ছবিতে দু'জায়গায় প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম লেখা খসড়ায় সোনা করার তাগিদ ও লোভটা আসে গিরিবালার দিক থেকে। তিনি Notes-এও লিখেছেন 'গিরিবালা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে তার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল— তারপর পরেশের ঘর থেকে পাথরটা সরাল' *'মাঝরাতে গিরিবালা স্বামীর বালিশের তলা থেকে পাথরটা নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে লোহার জিনিসপত্রগুলো সোনা করে ফেলে। সকালে স্বামীকে বলে। মতলব করে যে সোনার জিনিসগুলো বিক্রী করে টাকা নিয়ে তীর্থ করতে চলে যাবে। কিন্তু সোনা আর চাই না। পরেশ জিনিসপত্রগুলো বিক্রী করে টাকা নিয়ে আসুক— ফেরার পথে পাথরটা গঙ্গায় ফেলে আসুক।'*

বঞ্চিত জীবনে সৌভাগ্যকে চোখের সামনে দেখে গিরিবালা ও পরেশের ভয় ও আতঙ্ক সেই সঙ্গে সামান্য একটু আশা মেটানোর আকাঙ্ক্ষা, মনের এই দোলায়মানতা চরিত্র দুটিকে আরও বর্ণময় করে তোলে। সোনার প্রতি তাদের যেমন আজন্মলালিত সংস্কার ও মোহ আছে, তেমনই চকিতে ভাগ্য পরিবর্তনের অলৌকিক অবলম্বনকে 'চোরাই মাল' হিসেবে দেখার মধ্যে এক ধরনের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা ও মূল্যবোধ রয়েছে। ধর্মভীরু পরেশ কালীমূর্তির সামনে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে করজোড়ে বলে 'মা-মা— অপরাধ নিও না মা— আমি কালই গঙ্গার জলে ফেলে দোব, মা-মা অপরাধ নিও না মা।'

'পরেশ বেরিয়ে যায়। জিনিস বিক্রি করে টাকা পায়। বাসে-ট্রামে চড়তে সাহস হয় না। একটা Taxi ডাকে (Note : 'স্যাঁকরার দোকানের বাইরে thoroughfare-এ Taxi যাতায়াত করে এমন জায়গা') *Taxi চড়ে সে decide করে যে কলকাতা শহরটা একবার ঘুরে দেখবে। তার ট্যাকে পরশপাথর।'*

'Taxi করে যেতে যেতে সে নানারকম লোহার জিনিস দেখে (Such as হাওড়ার পুল, টালার ট্যাঙ্ক etc)। তার মাথায় নানারকম ফন্দি আসতে থাকে।' Notes *লেখা* : dream sequence টা day dreamingও হতে পারে— যখন Taxi করে যাচ্ছে।... পরেশের dream sequence— 'সে নিজাম হয়েছে অথবা আগা খাঁ হয়েছে।' জাহাজ charter করা, নারকোল ফাটিয়ে জাহাজ জলে ভাসানো, গুণমুগ্ধদের হাততালি দেবার কথাও লেখা। 'পরেশ মেমসাহেবের সঙ্গে নাচছে।... পরেশের ঘরের ক্যালেন্ডারে যে মেয়ের ছবি, dream sequence-এ তারই সঙ্গে নাচে।... দেশনেতা বা public figure-দের কী সম্মান তা যদি পরেশ গোড়াতেই দেখে তাহলে পরের dream টা আরো জমবে।... পরেশের statue unveil করা হচ্ছে। কুচকাওয়াচ— পরেশের body guard'।

নিতান্তই মধ্যবিত্ত মানসিকতায় পরেশের মনে ভালো-মন্দর যে সহজবোধ ছিল, পকেটে আশাতীত টাকা আসার পর সেটা আর থাকে না। মোহাবিষ্ট হয়ে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মনে করে টাকা দিয়ে দুনিয়াটাকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে, ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তি পাওয়ার সুপ্ত বাসনাগুলি একে-একে মনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের notes-এ দেখি পরেশ 'গঙ্গার ধারে পাথর ফেলতে গিয়ে এক মাঝবয়সী coupleকে দেখে, অত্যন্ত ধনী।' *এক জায়গায় দেখে একরাশ লোহালক্কড় পড়ে আছে। পরেশ Taxi থামায়। Scrap-এর দিকে দেখে।* Notes-এ লেখা 'Lorry করে scrap যাচ্ছে গঙ্গার ধার দিয়ে।' Scrap Iron dumping ground-এর পাশেই একটি উদ্বাস্তু পরিবার'। ধনী couple ও উদ্বাস্তু পরিবার এই দুটি বিপরীত অর্থনৈতিক অবস্থার নমুনা পরেশকে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত জীবন থেকে অনাস্বাদিত উপভোগের জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ছবির জন্য দৃশ্য পরিকল্পনায় সত্যজিৎ লেখেন 'Scrap Iron উঠিয়ে নিয়ে যাবে কী ভাবে? Lorry তে?... পরে Scrap Iron-এর জায়গাটা খালি হয়ে যাচ্ছে দেখাতে হবে— কিন্তু জায়গাটা চেনা যাবে কী ভাবে? একটা গাছ কিম্বা অন্য কোন একটা recognisable feature রাখতে হবে।'

'একটি ভিখারী এসে তার কাছে এসে ভিক্ষা চায়, পরেশ অন্যমনস্ক হয়ে তাকে একটা note দিয়ে ফেলে। তারপর সে চিন্তা করে গরীবের দুঃখ সে ইচ্ছা করলে অনেকটা দূর করতে পারে— তার হাতে সে ক্ষমতা আছে। পরেশ Scrap Iron-এর দর করে। সে পাথরটা ফেলে না।'

'আরো কিছু লোহার জিনিস বিক্রী করে সে থোক টাকা করে একটি বাড়ি করা শুরু করে।' দ্বিতীয় খসড়ায় লেখা, পরেশ নতুন ছাতা মাথায় দিয়ে, চোখে সোনার

পেনসেই চশমা পরে বাড়ির প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছে, কাজের তদারকি করছে। চারপাশ থেকে আসছে বাড়ি তৈরির জন্য ভারী যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ। তার নতুন বাড়ির নাম 'গিরিবালা ভবন।'

'*বাড়ি— তারপর Factory— তারপর প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে বহাল। প্রিয়তোষ-পরেশ Interview* (পরেশ যখন প্রিয়তোষকে interview করছে তখন তার হাবভাবটা তার নিজের অফিসের বড় সাহেবের মতো)। '*প্রিয়তোষ তার প্রেমিকা হিন্দোলাকে চাকরির খবর দিতে যায়। প্রিয়তোষ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু হিন্দোলা তাকে খেলাচ্ছে। প্রিয়তোষের চাকরিকে সে খুব একটা আমল দেয় না।*'

'*পরেশের Factory-তে সোনা তৈরি হতে শুরু করে।*' Notes লেখা: পাঁজি-কই? দাও ত দিকি, একটা ভালো দিন দেখে নতুন ব্যবসা লাগিয়ে দিই।... ফ্যাক্টরিতে লোহা গলে গলে bar হয়ে বেরোচ্ছে। পরেশের দেখে হাসি পায়। সে audibly হেসে ফেলে। পাশের লোক: কিছু বল্লেন স্যার। পরেশ: না। *সে সোনা মাড়োয়ারি Syndicate কে বিক্রী করে— টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। পরেশ অধিকাংশ টাকাই charity-তে খরচ করে।*'... Notes এ লেখা: 'পরেশ সোনা বিক্রী করছে— স্যাকরা? Marwari Syndicate? Bank?... Gold barগুলো কী ভাবে নেবে? পরেশ এক-এক দিন এক-এক রকম ছদ্মবেশে গিয়ে Gold bar বিক্রী করে আসে। একদিন কাবলি *সেজে যায়— সত্যিকার কাবলিওয়ালার সামনে পড়ে যায়।*' দ্বিতীয় খসড়ায় লেখা পরেশ Foundry থেকে Scrap Iron গলিয়ে Iron bar তৈরি হলে সেগুলো সোনা করে প্যাকেটে মুড়ে নিয়ে আসে bullion market-এ বিক্রির জন্য। এ জন্য দৃশ্য পরিকল্পনায় সত্যজিৎ ভেবেছিলেন 'Bullion Market-এর একটা long shot দিয়ে সোনা বিক্রীর scene টা আরম্ভ করলে ভালো হয়। FU তে conveniently একটা signboard থাকবে যেটা localityকে establish করবে।' পরে তিনি লেখেন 'পরেশের বাড়িতে Foundry থাকার প্রয়োজনটা কী? সে ত অন্য জায়গা থেকে লোহার bar তৈরি করিয়ে এনে বাড়িতে সেগুলোকে সোনা করতে পারে।' Foundry-র দৃশ্য বাদ পড়ে গেলে ভাবেন যে, 'প্রিয়তোষের roleটা Foundry manager না হয়ে Secretary হওয়া উচিৎ'। আগে তিনি ভেবেছিলেন 'প্রিয়তোষ— Secretary cum Manager'।

এর পর থেকে চিত্রনাট্যের কাঠামোর দুটি খসড়া লেখাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে পড়লে দেখা যায় প্রথমটির থেকে দ্বিতীয় খসড়ার ঘটনাবিন্যাস অনেকটাই পালটে গেছে।

'এদিকে মাড়োয়ারি Syndicate এ পরেশের Gold bars সম্বন্ধে কথা ওঠে। এবং মাড়োয়াড়ি মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। মাড়োয়াড়ি মহল থেকে কথা অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।' Notes এ লেখা : Rumour spread করছে— Tram, bus, queue– cinema, football ground, গঙ্গা (স্নান করার সময়), আড্ডা (তাস, পাশা, চায়ের দোকান), বাজার।

'একটা meeting *call করা হয়। তাতে কলকাতার গণ্যমান্য ধনী ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিরা সোনার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে। স্থির করা হয় তারা সকলে মিলে পরেশের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।'*

'পরেশের বাড়িতে delegation আসে (Meeting affected parties— either individually or jointly, হিন্দোলার বাবাও affected দের মধ্যে একজন হবেন)। *পরেশ তাদের সঙ্গে দেখা করে কিন্তু তার রহস্য প্রকাশ করে না। Delegation frustrated হয়ে চলে যায়। পরেশের ব্যবসা চলতে থাকে। সোনার দাম কমতে থাকে। চারদিকে repercussions।* (ভিখারীর হাতে সোনার গয়না— কিন্তু দুর্ভিক্ষ শেষ হয়নি)। *খবরের কাগজে, radio, ময়দানে বক্তৃতা ইত্যাদি। প্রিয়তোষ হিন্দোলাকে সোনার গয়না এবছরে দেয়। কিন্তু কী চাকরি করছে তা কিছুতেই বলে না। পরেশের বাড়ির চেহারা বদলে গেছে— দারোয়ান, বেহারা, Secretary গিসগিস করছে।'* পরে লিখেছেন 'পরেশের চাকর ভজা একাই চাপরাশি, বেহারা, দারোয়ান ইত্যাদির জায়গা নেবে (Quick change of dress)। এ ছাড়া সে অবিশ্যি ভজার অভিনয়ও করে, 'তামাকটা দে তো ভজা'। *'পরেশের স্ত্রীর গা বোঝাই গয়না'।* Notes-এ আছে 'গিরিবালা হাঁটলে তার পায়ের মলের শব্দ plus গায়ের অজস্র গয়নার ঝনঝনানি— গিরিবালা মাস্টার রেখে গান শিখছে— হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান।... পরেশ আর বাইরে বেরোতে পারে না, সেটা তার একটা দুঃখ'।

'সোনার দাম কমতে চতুর্দিকে Panic। পরেশকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার Manager-কেই ধরা যাক।' কোনও একজন ধনী ব্যক্তি পরেশের সঙ্গে একটা collaboration এর মতলব নিয়ে কথা বলতে আসতে পারে, when others are hostile, I'm friendly with you, sir।

'প্রিয়তোষ kidnapped হয়। তার উপর third degree প্রয়োগ করা হয়। অথবা একটা chase। প্রিয়তোষকে ধরতে পারে না। প্রিয়তোষ হিন্দোলার কাছে যায়।' Notes-এ দেখি হিন্দোলার বাবা প্রিয়তোষকে বলে যে সে যদি পাথরটা দিয়ে দেয়, তা হলে প্রিয়তোষ তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। প্রিয়তোষ রাজি হয়— তারপর হিন্দোলার বাড়িতে গিয়ে দেখে, সে গুঞ্জন ঘোষের সঙ্গে flirt করছে।

(সত্যজিৎ রায় পরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন 'যেখানে Gold এর দাম এত কম সেখানে আর মিঃ মজুমদার পাথরটার উপর এত চোখ দেবেন কেন?)' jilted. প্রিয়তোষ despondent হয়ে বাড়ি ফেরে। Suicide-এর mood। আর কিছু পায় না। পাথরটা গিলে ফেলে।

পরেশ বাইরে গিয়েছিল— এবারে তার মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে। সে বুঝেছে পরশপাথর দিয়ে তার পক্ষে পৃথিবীর দুঃখ দূর করা সম্ভব না। সে চায় যে পাথরটাকে যে করে হোক বিদেয় করে দেবে। বাড়ি আসে— দেখে যে প্রিয়তোষ পাথরটা গিলে বসে আছে।

consternation। ডাক্তারখানা। X-Ray। পাথরটা আটকে আছে— নামছে না।

পরেশ বাড়ি ফিরে আসে— despondent। হঠাৎ দেখে যে সোনার জেল্লা কমে যাচ্ছে। কী ব্যাপার। ডাক্তারখানায় Telephone করে। আরেকটা X-Ray করে দেখা যায় যে পাথরের size ছোট হয়ে গেছে। প্রিয়তোষ পাথরটাকে হজম করে ফেলেছে।

প্রিয়তোষ ভালো হয়ে ওঠে এবং realise করে যে কামিনী-কাঞ্চন দুই-ই rubish। পরেশ সোনা ছেড়ে লোহার কারবার ধরে।'

এই খসড়া অনুযায়ী সত্যজিৎ রায় যে চরিত্রগুলির কথা ভেবেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল— পরেশ (৫৬) গিরিবালা (৪৮) প্রিয়তোষ (২৪) ভজা (৩০) হিন্দোলা (২০) হিন্দোলার বাবা মিঃ মজুমদার (৫৫) গুঞ্জন ঘোষ (২৬) প্রিয়তোষের বাবা-মা, হিন্দোলার বন্ধুবান্ধব (smart set), পরেশের অফিসের লোক, পাড়াপড়শি, মাড়োয়াড়ি Syndicate-এর লোক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, খবরের কাগজের অফিসের লোক, ব্যাঙ্কের লোক, স্যাঁকরার দোকানের লোক, পলিটিশিয়ান, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিওয়ালা। দৃশ্যবিন্যাস অনুযায়ী যে পরিবেশ (Location)-এর কথা ভাবা হয়েছিল তাতে ছবির দৃশ্য ছাড়াও পরেশের ফ্যাক্টরি, হিন্দোলার বাড়ি, প্রিয়তোষের বাড়ি, ব্যাঙ্ক ও মাড়োয়াড়ি Syndicate-এর দৃশ্যও ছিল।

কাঠামোর দ্বিতীয় খসড়া থেকেই সত্যজিৎ রায় ঘটনার ডালপালা ছেঁটে ক্রমশ পরেশকে কাহিনির মূল চরিত্র হিসেবে খাড়া করছেন। লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তার দিকেই। পরেশের মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি লেখেন, পাথরটা পাওয়ার পর থেকে শেষ অবধি পরেশের emotional pattern-টা এই ভাবে যাবে—

১) Religious fear– fear of the supernatural.

২) Calm determination to throw away the stone but natural desire to make use of gold already made. Expection of a quiet life free from worry-humdrum.

৩) Greed– possession of money plus delusions of grandeur of high life, public acclaim & popularity.

৪) Fulfilment of ambition— upto a point– comparative peace of mind– but high living contains seeds of destruction for a man of Paresh's upbringing & habits.

৫) Remorse & fear of discovery after fiasco at Party.

৬) Definite decision to escape from it all– সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। A Good name is more to be cherished than Great Riches.

'public acclaim & popularity' এই বিষয়ভাবনার থেকেই সত্যজিতের মনে হয়েছে যে একটা সংবর্ধনা সভার দৃশ্য থাকলে ভালো হয়। দৃশ্যটা পরেশের day dreams-এর দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। সেটা ছিল তার বিলাসী ভাবনার delusion-এ, আর একটা হবে বাস্তবে। প্রথম খসড়াতেই প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখি 'পরেশ অধিকাংশ টাকাই charity-তে খরচ করে।' দ্বিতীয় খসড়াতে প্রিয়তোষের সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণে তিনি লেখেন 'It is established that Paresh's present income is based not on the manufacture of gold but on the judicious investment of the money he has acquired by his initial sale of gold. Much of the money is now spent on quite indiscriminate charities– probably because it is the quickest way to gain popularity.' তাঁর Notes-এও এক জায়গায় লেখা আছে 'পরেশ Greed motive থেকেই সোনা তৈরি শুরু করে। গোড়ার দিকে philanthropy টা একটা incidental ব্যাপার হবে। যেমন বড়লোকরা কতকটা অপর্যাপ্ত আছে বলে, কতকটা নামের জন্য charity করে থাকে।' বড়লোক হওয়ার পর পরেশের মানসিকতার সম্পর্কে সত্যজিৎ লিখেছেন 'It seems now to have acquired a new significance– pomp-pagentry-eminence.' তাই সংবর্ধনা সভার দৃশ্যটি জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু পরেশের একজন কেউকেটা হওয়ার জন্য কৃতকর্মটা কী? একমাত্র অকাতরে দানধ্যান ছাড়া? এ প্রশ্নর উত্তর ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যারা অনুষ্ঠানের আয়োজক, তাদের জানা নেই। তাই ছবিতে সেক্রেটারি অতনু বলে 'উনি আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে যেভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, এর-নানান-মানে ইয়ের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই অবিদিত নেই।'

পরেশের পরের অবস্থাতেও একটা মধ্যবিত্ত মানসিকতার রেশ থেকে যায় Fulfilment of ambition— upto a point তার হাবভাবে সত্যজিতের কথায়... 'একটা lower, middle class mannerism তার পরের অবস্থাতেও persist করবে।' সে একটা গাড়ি কিনেছে। এ সম্পর্কেও সত্যজিৎ ভেবেছেন যে পরেশ একটা

পুরোনো model-এর বড় second hand গাড়ি কিনবে, তাতে আভিজাত্যও বজায় থাকবে দামও সস্তা হবে। 'পরেশের দুরকম চশমা। দুটো specs এ গুলিয়ে ফেলছে।' এ সবই তার upbringing ও পুরোনো habit-এর প্রতিফলন।

প্রিয়তোষের সঙ্গে কথাবার্তার পর পরেশ চলে আসে তার শোওয়ার ঘরে। নতুন অবস্থায় গিরিবালার সঙ্গে তাকে এই প্রথমবার দেখা যায়, 'The bedroom has a surprisingly old fashioned look. It is obviously designed to provide the sort of comfort that Paresh is used to all his life.' খেরোর খাতায় তাঁর Notes-এ দেখি 'পরেশের পুরোনো বাড়ির একটা কোনও বিশেষ familiar prop তার নতুন বাড়িতে থাকবে— এবং এতে Iron to Gold– Gold to Iron— transformationটা খুব important হবে visually'. ছবিতে দেখা যায় পরেশের পুরোনো বাড়ির paper-weightটা— যেটা হাতে নিয়ে হিটলার-সদৃশ পুলিশ ইনস্পেক্টর সুবোধ পারসিভ্যাল চ্যাটার্জি ডাক্তারের চেম্বারের সামনে উৎকণ্ঠাভরে অপেক্ষা করছিল— প্রিয়তোষের পেটে গিলে-ফেলা পরশপাথরের হালটা কী সেটা জানার জন্য। 'গলে গেছে' শুনে তার হাতের কাঁপুনি ও চোখে মুখে গভীর হতাশার ছাপ যেন বার্লিন পতনের বার্তা এনে দেয়।

খসড়া অনুযায়ী নতুন বাড়ির শোওয়ার ঘরের দৃশ্যে আমরা দেখি গিরিবালাকে, পরেশ যখন আরও একটা গয়না এনে দেয়। সেটা হাতে নিয়ে গিরিবালা আরও একটা গয়নার আবদার করে। আর স্বামীকে আশ্বাস দেয় সেটাই হবে তার শেষ চাহিদা। পরেশ তাকে সাবধান করে, বলে বাজারে আরও যদি সোনা এসে যায় তবে সোনার দাম হু হু করে পড়ে যাবে। তখন সোনা এতই মূল্যহীন হয়ে যাবে যে লোকে সোনার চাইতে রুপোর গয়নার কদর করবে বেশি। গিরিবালা আতঙ্কিত হয়ে বলে, 'ওরে বাবা তাহলে এ পাথর বিদেয় কর।' চিত্রনাট্য ও ছবিতে দৃশ্যটি অন্য রকম। ছবিতে পরেশই স্ত্রীর কাছে তার প্রতিপত্তি জাহির করে। বলে, পছন্দ হয়েছে? একজোড়া বাঁকমলের order দিইচি— বুধবার দেবে—।' গিরিবালার এ কথা শুনে ভয় করে, বলে 'সিন্দুকটার দিকে দেখি আর বুকটা ঢিপ ঢিপ করে।' চিত্রনাট্যের প্রথম দিককার খসড়ায় দেখি গিরিবালা আক্ষেপ করে বলে 'কোথায় দুজনে মিলে দেশ দেখব— তীর্থ করব... আবার সংসারে জড়িয়ে পড়তে হোল, পায়ে সোনার শেকল বেঁধে বসে থাকা।' গিরিবালা যখন পুরোনো পাড়ার চাটুজ্জে গিন্নী, লেবু, টেবু, হরেনের মা, পল্টুর খোঁজখবর নিতে চায়, পরেশ বলে ওঠে 'কী সর্বনাশ, ওদের দিয়ে কী হবে।' গিরি: কী আবার হবে, তেইশ বছর ছিলুম ওখানে তাই মনে পড়ে। পরেশ: ও সব ভুলে যাও গিন্নী— আমাদের দুঃখের দিনের (কথা)। আমাদের এখন সোনার সংসার।

ভজু পরেশকে তামাক এনে দেয়। জমিদারি মেজাজে ইজিচেয়ারে বসে তামাক খায়। পরেশের ইলেকশনে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গ পরের সংযোজন।

সত্যজিৎ রায় ভেবেছিলেন 'পাথরটা প্রায় হারিয়ে যেতে পারে।' এ রকম পরিস্থিতি নিয়ে কোনও দৃশ্য পরিকল্পনা চিত্রনাট্যে আমাদের চোখে পড়ে না।

এই খসড়া থেকেই সত্যজিৎ রায় হিন্দোলার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছেন 'Priyatosh's just telephone conversation with Hindola'। তাই প্রথম খসড়ার থেকে অনেক দৃশ্য ও প্রসঙ্গ বাদ পড়ে গেছে। যেমন হিন্দোলার বাড়ি, তার বাবা, মা, বন্ধু-বান্ধব, তেমনই বাদ গেছে প্রিয়তোষের বাড়ি ও তার মা-বাবার প্রসঙ্গ।

High life contains seeds of destruction-এর দৃশ্যরূপ আসে ৫নং সিকোয়েন্সে। কাচালুর বাড়িতে ককটেল পার্টির দৃশ্যে কৃপারাম কাচালু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'কাচালুর বুদ্ধি Moron-এর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু তার টাকা এবং position আছে— he can be a menace এবং সরকার ও পুলিশ তার কথায় কাজ করতে পারে।' ছবিতে যদিও কাচালুকে কোনও সময়েই Moron বলে আমাদের মনে হয়নি। ককটেল পার্টির প্রসঙ্গে সত্যজিৎ লিখেছেন 'What can be occasion for?'

দ্বিতীয় খসড়ায় ককটেল পার্টির বর্ণনা থাকলেও শুটিং স্ক্রিপ্টে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খসড়ায় সত্যজিৎ এক জায়গায় লিখেছেন যে এই কেতাদুরস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির পার্টিতে পরেশ নেশার আমেজে জমিদারি মেজাজে যেন মাইফেলের আসর বসাতে চায়। এক সময়ে বলে ওঠে 'একটু গানটান হোক, বাইজিরা সব কোথায়।' অন্য নিমন্ত্রিতরা পরেশের অসংযত ব্যবহারে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলে পরেশ বলে 'আমি কে জানেন? Voice (their falseto) : You are an uncivilized brute... get out.' দৃশ্যটির বিবরণ দেখি তাঁর Notes এ : 'পরেশ অবিচলিতভাবে তার কোটটা খুলে ফেলে। তার তলায় দেখা যায় ফতুয়া। সেটা সে pant-এর ভেতর থেকে টেনে বার করে। Pocket-এ Safety pin আঁটা— সেটা খুলে দাঁতে কামড়ে পাথরটা বের করে দেখায়। বলে 'এটা কী জানেন?' Notes-এর আর এক জায়গায় লেখা 'পরেশ মূর্তিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে— একটা ritual-এর atmosphere এসে পড়ে (appropriate music– হয়তো সাপের বাঁশি ব্যবহার হতে পারে)— এগোচ্ছে-পেছোচ্ছে-এগোচ্ছে-পেছোচ্ছে নাচের মত।' Demonstration-এর পর পরেশ কোটটাকে ফেলেই চলে যায়। পরদিন যখন (কাচালু) তার বাড়িতে formula চাইতে আসে— তখন সে সঙ্গে bearer-এর হাতে hanger-এ ঝুলিয়ে কোটটাকে নিয়ে আসে।

পরদিন সকালবেলা নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পর গতরাতের কেলেঙ্কারির জন্য অনুতপ্ত পরেশকে গুম মেরে বিছানায় বসে থাকতে দেখা যায়। গিরিবালা এই বুড়ো বয়সে ভীমরতির জন্য শাপ-শাপান্ত করে। যত নষ্টের গোড়া হল ওই পাথর। ওটাকে এক্ষুনি বিদেয় করে দেওয়া দরকার। ভজু এসে বাবুকে তামাক দিয়ে যায়। হাতে সেই পুরোনো হুক্কা।

এ দিকে প্রিয়তোষ হিন্দোলাকে তার অনুরাগের জন্য অনুনয়-বিনয় করে। একতরফা কথা শুনে বোঝা যায়, হিন্দোলা এখনও প্রিয়তোষকে ল্যাজে খেলাচ্ছে।

শেঠজি আসে, ফর্মুলা জানতে চায়। পরেশ সংস্কৃতে তার ফর্মুলা জানায়। এই খসড়ায়, ফর্মুলা যে 'ব্রিঘাংচু' গল্পের ওই চার লাইনের কবিতা, তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। পরেশ বুঝতে পারে তার বিপদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে প্রিয়তোষকে স্থাবর সম্পত্তি দান করে তীর্থের দিকে পা বাড়ায়, পাথরটিও তার জিম্মায় রেখে যায়। ইতিমধ্যে পরেশের ফর্মুলার ধাপ্পা ধরা পড়ার পর কাচালু মারফত সোনা তৈরির রহস্য সারা শহরে জানাজানি হয়ে যায়। সরকার পুলিশ ব্যবসায়ী মহলের টনক নড়ে। আতঙ্ক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরেশের বাড়িতে পুলিশ আসে। পরেশকে হাতেনাতে ধরতে না পারায়·তার পেছনে একদল পুলিশ ধাওয়া করে। এ দিকে হিন্দোলা এ সব খবর জানার পর, এই ছুতোয় প্রিয়তোষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে। দুঃখ অভিমানে প্রিয়তোষ হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে পাথরটি গিলেই আত্মহত্যা করতে চায়।

সত্যজিতের Notes-এ দেখি *'পরেশ স্টেশনে রওনা হয় তার মোটর গাড়িতেই— ঘোড়ার গাড়িতে না, পথে গাড়িটা খারাপ হয়ে যায়— Red Road এ। তাতে পুলিশ ধরে ফেলার সুযোগ পাবে। এ ছাড়া interruptions থাকবেই— সেগুলো খুব comical হতে পারে।'* এ সম্পর্কে তিনি খোঁজ নেওয়ার জন্য লিখে রেখেছেন Red Road এ faddists (walking race practice করছে ইত্যাদি) গরু বা ভেড়ারা কি সকালবেলা রাস্তায় থাকতে পারে—'। এ দিকে 'প্রিয়তোষ পাথরটা গিলে ফেলে। সে ভাবে আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সে মরে যাবে। প্রিয়তোষ বাঁচবে কি মরবে সেই নিয়েও একটা suspense রাখা দরকার।' এর পর খসড়ায় দেখি, পরেশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই থানায় আসে। ডাক্তারের চেম্বারে প্রিয়তোষ। সে তার অভূতপূর্ব মেটাবলিজমে পাথরটিকে হজম করে ফেলে। পাথর হজম করে ফেলার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনায় ডাক্তার নন্দী পরেশকে জিজ্ঞেস করে 'ওটা stone তো? লজেঞ্চুস নয়?

পরেশ: পাগল!

ডাক্তার: আপনি চেখে দেখেছিলেন কি?'

পরবর্তী ভাবনায় পরেশ যেহেতু ডাক্তারের মুখোমুখি হয় না, তাই দৃশ্যটি ছবি থেকে বাদ গেছে।

পাথর হজম হয়ে যাওয়ার পর প্রিয়তোষ নিশ্চিন্তে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে। বলে 'কামিনী কাঞ্চন দুই-ই পরিত্যাজ্য।'

ডাক্তার নন্দী বলে 'এ তো রামকৃষ্ণদেবের কথা'।

প্রিয়তোষ: সেন্ট ফ্রান্সিসেরও।

প্রিয়তোষ যে নারীবিদ্বেষী নয় এটা স্পষ্ট করে তোলার জন্য সত্যজিৎ তাঁর Notes-এ দৃশ্যটি অন্যভাবে লেখেন।

'প্রিয়তোষ: কামিনী-কাঞ্চন দুটোই... (হঠাৎ একটি সুন্দরী Nurse-কে দেখে তার কথা আটকে গেলো) আচ্ছা আমি তাহলে... (awkward embarrassed exit। এটা করলে প্রিয়তোষ ভবিষ্যতে নারী ঘটিত আরও complication-এ জড়িয়ে পড়তে পারে এবং ultimately একটা বউও ঘরে আনার সম্ভাবনা established হয়। সে পুরোপুরি misogynistic হয়ে যায় নি। তার disappointment টা কেবল Hindola সম্পর্কে।')

পরেশ ও গিরিবালাকে আর পুলিশের হেফাজতে থাকতে হয় না, কেননা ততক্ষণে সব সোনা লোহা হয়ে গেছে। পরেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে থানা থেকে বেরিয়ে আসার মুখে দেখা হয় এক গান্ধিটুপি পরা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে। তিনি জানান যে, 'সরকার যদিও আপনার ফর্মুলা ব্যবহার করতে পারছে না, আর দুনিয়া জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য আপনাকেও ব্যবহার করতে দিতে অসম্মত, তবু এই আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্য আপনাকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে।' পকেট থেকে একটা চোথা কাগজ বের করে তাতে চোখ বুলিয়ে বলেন, এই সম্মানের নাম হল— স্বর্ণ বিভীষণ (খেরোর খাতায় সোনার পাথরবাটি, সোনার বল ও স্বর্ণ বিভীষণ এই তিনটে কথা দেখা যায়)। অবাক হয়ে পরেশ বলে, বুঝলাম না!

—কেন আপনি পরেশচন্দ্র দত্ত নন।

—হ্যাঁ।

—আপনি সোনা বানানোর ফর্মুলা বের করেননি?

—পরেশ মাথা নাড়ে।

—তবে কে?

পরেশ আকাশের দিকে ছাতা তুলে দেখায়। আকাশে তখন বজ্রপাতের ভারী শব্দ। 'নমস্কার' বলে পরেশ ঘোড়ার গাড়িতে ওঠে।

রাস্তায় খবরের কাগজের হকার চেঁচিয়ে চলেছে 'সোনা লোহা হয়ে গেল (Gold turns into iron)'।

*

চিত্রনাট্য লেখার জন্য তৈরি খসড়া কাঠামো দুটি ও চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়ার উদ্ধৃত অংশবিশেষকে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে পরিচালক সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁর প্রাথমিক ভাবনার অনেক অংশ বাদ দিয়েছেন। গল্পের ঘটনাক্রমকে তো আগাগোড়াই পালটে নতুন ভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন।

ছবিতে পরেশের ট্যাক্সি করে সারা কলকাতা শহর ঘোরার পরের দৃশ্যেই দেখি তার সংবর্ধনা-সভা। বাড়ি বানানো বা সোনা তৈরির কোনও দৃশ্য নেই। Foundry-র প্রসঙ্গটি সঙ্গত কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছে, সেজন্য পরিচালকের ব্যাখ্যাটিও স্পষ্ট। বাদ গেছে মাড়োয়াড়ি Syndicate বা সোনা বিক্রির দৃশ্য (ছবিতে একবারই আছে)। সংবর্ধনা সভা, নতুন বাড়িতে আসা— প্রিয়তোষের সঙ্গে কথাবার্তা— শোওয়ার ঘরে গিন্নিকে সোহাগ করে গয়না দেওয়া— এ ক'টি দৃশ্যেই দর্শক বুঝে যায় পরেশের বর্তমান জীবনযাপন ও মনের গতিপ্রকৃতি। এর পরেই আসে কাচালুর পার্টি। হিন্দোলার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণই উহ্য। এই সব দৃশ্য বাদ দেওয়ার ফলে ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র পরেশচন্দ্র দত্ত পূর্ণ মনোযোগ পায়। পরশপাথর রহস্য সারা শহরে জানাজানি হওয়ার পর চারিদিকে যেভাবে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, সে দৃশ্যগুলি টুকরো টুকরো ভাবে মনতাজের মাধ্যমে দেখিয়ে, সঙ্গে নেপথ্য বিবরণীর সাহায্যে ছবির Time-Space-কে আরও ঘনসংবদ্ধ করা হয়েছে।

খসড়া লেখা থেকে যেমন অনেক ঘটনা ও দৃশ্য বাদ দিয়েছেন, তেমনই অনেক দৃশ্য নতুন করে সংযোজনও করেছেন। প্রথম খসড়ার প্রিয়তোষকে chase বা তার ওপরে Third degree প্রয়োগকে বাদ দিয়ে তিনি দ্বিতীয় খসড়াতেই বিশদভাবে এনেছেন ডাক্তারখানার দৃশ্য। তেমনই দ্বিতীয় খসড়ার সরকারি কর্মচারী মারফত 'স্বর্ণ বিভীষণ' খেতাব দেওয়ার প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে ছবিতে এনেছেন পুলিশ থানার দৃশ্য। থানার পুলিশ অফিসারের জেরার মুখে শুনি পরেশের করুণ ও কাতর স্বীকারোক্তি, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু— সবই জানতুম— কিন্তু কী ভাবলুম জানেন? মরতে ত হবেই— আর কটা দিনই বা। জীবনে সুখভোগ আর হোল না— তাও এই পাথরের জোরে যদি কটা দিন...।' ছবির শেষে এই দৃশ্যেই পরেশের চরিত্রটি

সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সৌভাগ্যকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তার আশা আকাঙ্ক্ষা মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমা ছাড়ায় না বা মানবিক মূল্যবোধ থেকে কখনও বিচ্যুত হয় না। 'বাড়ি একটা করিছি, আর গিন্নীর ফুলের শখ, তাই একটা বাগান করিছি, আর একখানা গাড়ি— তাও second hand... ট্রামে বাসে চড়ে বিস্তর নাকাল হইচি স্যার— সাতবার পকেটমার গেচে, তিনবার হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়েছে... এই এখনো দাগ রয়েছে... তাই গাড়িটা কিনলুম। সোনা আগে যা করেছিলুম, তারপর থেকে এতটুকু সোনা আমি করিনি স্যার।' অনুশোচনা প্রকাশের মধ্যেই তার চরিত্রের সহজ সরল রূপটা বেরিয়ে আসে।

রাজশেখর বসুর গল্পে ঘটনাগুলো মূলত পরশপাথর ঘিরে। এর ভেলকিতে সর্বত্র যে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধে, তাকে সামাল দেওয়ার জন্য দুনিয়াসুদ্ধ মানুষজনের একেবারে নাজেহাল অবস্থা। পরেশ সেখানে নির্বিকার। আর এর পাশাপাশি আছে প্রিয়তোষ-হিন্দোলার দোদুল্যমান সম্পর্ক।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির কেন্দ্রস্থলে আছে পরেশ। জীবনের এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে সে যখন দাঁড়িয়ে, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে এক অলৌকিক পাথরের সন্ধান পায়। সেটির দৌলতে তার হৃতমান জীবনে অপূর্ণ ইচ্ছাপূরণের সাধ মেটাতে গিয়ে দেখল আরও এক বিষম পরিস্থিতির মুখোমুখি। যেখানে শুধু তার শান্তি না, জীবনও বিপন্ন। ভেলকি পাথর যেভাবে আসে সেভাবেই উবে যায়। দুটোই যুক্তিতর্কের অতীত, দুটোই বাস্তব-স্পর্শশূন্য। এর ফলে পরেশের হয় অলীক অসম্ভবের জগতে কিছু দিন কাটানোর মতো অপার্থিব অভিজ্ঞতা। Allegory of Magic-কে অবলম্বন করে সত্যজিৎ চাইলেন একটি দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ— যার জীবনে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও দামই নেই, যে যদি হঠাৎ ইচ্ছাপূরণের জগতে এসে পড়ে, তা হলে তার মনের সুপ্ত ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি কীভাবে প্রকাশ পায় আর তার দৌড় কত দূর, সেটিকে দেখানোর মধ্য দিয়ে শ্রেণিচরিত্র ও মানসিকতাকে তুলে ধরতে। এর পাশে আছে সমাজের নানা ধরনের মানুষজন। আছে শেঠ কৃপারাম কাচালু বা পুলিশ ইনস্পেক্টর সুবোধ পারসিভ্যাল চ্যাটার্জির মতো লোকজন। যাদের লোভের মাত্রা অন্যদের সর্বনাশের ভয় দেখায়। আছে ডাক্তার নন্দীর মতো মানুষ— যারা কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখার বাইরের ঘটনায় বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে পড়ে। আছে প্রিয়তোষের মতো লোভশূন্য সাধারণ মানুষ— যারা প্রয়োজনের বাইরের কোনও কিছুর আকর্ষণেই বিচলিত নয়, শুধু ভালবাসার মধ্যেই জীবনের আনন্দ খোঁজে। আর আছে পরেশচন্দ্র দত্ত—যার সরল জীবনযাত্রা দৌলতের প্রভাবে হয়ে ওঠে জটিল, লোভের তাড়নায় ভালমন্দর ভেদরেখা হয়ে যায় ধূসর, সমাজে কেউকেটা হওয়ার

আশায় উচ্চশ্রেণির সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করতে গিয়ে বেমানান পরিবেশে হয়ে ওঠে পরিহাসের পাত্র। হৃতমান জীবন থেকে উঠে আসা এই মানুষটির শূন্যগর্ভ আস্ফালন সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। তার অহংকার ও আস্ফালন স্বোপার্জিত বৈভবের কারণে নয়, আছে অলৌকিকের ওপর ভিত্তি করে। পাথরের ভেলকি তাকে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করায় না। এই ভিত্তিহীন আজগুবি রাজ্যে সে নিরালম্ব অবস্থানের প্রতীক হয়ে ওঠে।

নিরালম্ব অস্তিত্বের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে পরেশ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে— 'আগে তো একটু হাওয়া খাব বাবা। আজকের দিনটা বড় ভালো।' একই সংলাপ ছবির দুটি দৃশ্যে পুনরাবৃত্ত হয়। দৃশ্য দুটির অন্তর্বর্তী সময় পরেশের কাছে যেন স্বপ্নপূরণের আশায় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা।

[illegible]

[illegible] Dalhousie Square [illegible]

[illegible]

খেরোর খাতা। চিত্রনাট্য: পরশপাথর (প্রথম খসড়া)

খেরোর খাতা। চিত্রনাট্য: পরশপাথর (বর্জিত অংশ)

'পথের পাঁচালী'র পঞ্চাশ বছর

আম আঁটির ভেঁপু-বইটির অলংকরণের সূত্রেই *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের পরিচয়। এর আগে মূল উপন্যাসটি তিনি পড়েননি। শুধু এটা কেন, তখনকার সময়ের নামকরা অনেক বাঙালি সাহিত্যিকের লেখাও পড়েননি বলে দিলীপকুমার গুপ্তের কাছে বকুনি খেয়েছিলেন। ডি. কে. গুপ্ত তাঁর সংগ্রহ থেকে একরাশ বাংলা বই দিয়ে বলেছিলেন 'এগুলো পড়ো।' গল্প বা উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন হল লিখিত ঘটনা বা ভাবের চিত্রময় প্রকাশ। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার সময় যেভাবে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের দিকে নজর রাখতে হয়, তারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে তুলির আঁচড়ে করতে হয়। *আম আঁটির ভেঁপু*-র ইলাস্ট্রেশনের সুবাদে তাঁর মনে হল, এ রকম কাহিনিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ পরিবেশে একটি শিল্পসম্মত ছবি করা যায় যাতে রূপময় বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর পরিপ্রেক্ষিতে পল্লিজীবনের মানুষের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি বেঁচে থাকার ইচ্ছাকেও প্রকাশ করা যাবে। শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষার রীতি ও ধরন তাঁকে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে— কীভাবে একটি বিষয়কে দেখতে হয় ও তাকে প্রকাশ করতে হয়। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু শিখিয়েছেন বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণছন্দকে অনুভব করে তাকে প্রকাশ করার রীতি প্রকরণ। বিষয়ের স্বাভাবিক উন্মেষ ও প্রকাশের আনন্দরূপ মূর্ত করাই শিল্পীর কর্তব্য ও সাধনা। বিনোদবিহারী শেখালেন বিষয়বস্তুর পারস্পরিক টেনশনের সঙ্গে মিলিয়ে সমগ্র

কম্পোজিশনের টেনশনকে প্রকাশ করার কায়দা। শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের ফলে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন শিল্পে দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতির অন্তরাত্মাকে প্রকাশের শিল্পভাবনায় ভারতীয়দের গুরুত্ব। সত্যজিৎ রায় স্বীকার করেছেন যে, "আমি জানি না আমার পক্ষে *পথের পাঁচালী* করা সম্ভব হত কি না যদি না শান্তিনিকেতনে শিক্ষানবিশীর সুযোগ আমার জীবনে ঘটতো। ওইখানেই আমি শিখেছি প্রকৃতিকে কি করে দেখতে হয়, কিভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হয় এবং কি করে প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত ছন্দকে অনুভব করতে হয়।" নন্দলাল বসুর সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি লিখেছেন, "আমার *পথের পাঁচালী*র ভিসুয়ালের মধ্যে যা সাদা কালোর ডায়ানামিক্‌স ও সামঞ্জস্য রয়েছে সেটা নন্দলালের দান বলে আমি মনে করি।"

চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে আর পাঁচজনের মতোই ছিল নায়ক-নায়িকা ভিত্তিক। ক্রমে সেটা হল পরিচালক-ভিত্তিক। চলচ্চিত্রের বিচার চলে দু'দিক থেকে— ভিতরের বস্তু আর বাইরের রূপ। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কাহিনির গঠন, সৃষ্ট চরিত্রের সমস্যা, তাদের চরিত্ররূপ, পরস্পরের সম্পর্কঘটিত নাট্যগতির রস আর তাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশভঙ্গী— এ সব হচ্ছে এক শ্রেণীর বিচার্য। কিন্তু ফিল্মের যেটা দৃশ্যরূপ— চোখের সামনে আমরা কি জিনিস দেখছি এবং কোন জিনিস কিভাবে দেখান হচ্ছে তার সমস্যা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমস্যা। পরিচালক তাঁর ক্যামেরার সাহায্যে কি করেছেন তার উপরেই এই দৃশ্যরূপের নির্ভর।" অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি আকর্ষণ কাটিয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন পরিচালকের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিকে নজর এল, তখন থেকে তিনি একজন স্রষ্টার দৃষ্টিতে ছবি দেখতে শিখলেন, সেই সঙ্গে ছবির রসাস্বাদনও গভীর হল। ছবি তৈরি করার কথা তখনও মাথায় আসেনি। চাকরি করে মাকে নিয়ে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করা গেছে। বিয়েটা ছিল জরুরি, কেননা সে সম্পর্কটা অনেক দিনের। তাই এ সব কর্তব্য মুলতুবি রেখে সিনেমার পরিচালক হওয়া প্রায় বিলাসী কল্পনা। অফিসের কাজে দক্ষতার জন্য তাঁকে কয়েক মাসের জন্য বিদেশে পাঠানো হল, উদ্দেশ্য সেখানকার অফিসে কাজ করা ও কাজ শেখা। বিদেশে সময়টা ব্যবহার করলেন দু'ভাবে— পেশাগত কাজে আর নিজের শখ মেটাতে। যে জন্য তাঁকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে সে কাজে অবহেলা করার মতো মানসিকতা তাঁর নয়। নিষ্ঠাভরে সে কাজ করেছেন, সেই সঙ্গে বাকি সময়ের থেকে কিছুটা উদ্বৃত্ত করে তিনি সস্ত্রীক ছবি দেখেছেন নিয়মিত, প্রায় প্রতিদিনই। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল, তিনি চাকরির নিরাপত্তার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতারও হদিশ

পেলেন। চাকরি হল অনেকটাই অফিসের উপরওয়ালার নির্দেশ মানা ও ক্লায়েন্টের চাহিদা মেটানো। দুটোতেই মৌলিকত্ব বা নিজস্বতা খর্ব হতে বাধ্য। এ জন্য চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। ব্যক্তিত্ববান মানুষের দ্বন্দ্বটা শুরু হয় এখান থেকেই। যাঁরা কর্মক্ষেত্রে আপসহীন, যাঁদের আত্মসম্মান, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস আছে, তাঁরা এ অবস্থায় এমন সব সিদ্ধান্ত নেন যেটা সাধারণ মানুষের ছা-পোষা ধারণায় মনে হবে প্রায় আত্মহত্যার শামিল বা নির্বোধ অপরিণত বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।

বিলেতে থাকাকালীন তাঁর দেখা অসংখ্য ছবির মধ্যে এমন কয়েকটি ছবিও ছিল, সিনেমার সমালোচকদের সংজ্ঞায় যাদের বলা হয় নিও-রিয়েলিস্টিক। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাইরের চাকচিক্য একটু বিসর্জন দিয়েও অল্প খরচায় জরুরি, প্রাসঙ্গিক ও নিজস্ব বক্তব্যকে প্রকাশ করা। ভিত্তোরিও ডি সিকার *বাইসাইকেল থিভস্* হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের ধারণার ভিত নাড়িয়ে দিল। তা হলে কম পয়সায়ও ছবি করা যায়! অপেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে, স্টুডিওর ভাড়া বাঁচিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক আলোছায়াতে ছবি করা সম্ভব হলে, নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে রূপায়িত করার জন্য, লাভের কথা চিন্তা না করেও একেবারে আর্থিক ভরাডুবির মতো পরিস্থিতিকে বাঁচিয়ে যদি ছবি তৈরি করা যায় তো মন্দ কী? *পথের পাঁচালীর* কাহিনি হল সে দিক থেকে একেবারে মনের মতো, যাকে বলা যায় আদর্শস্থানীয়। ব্যস্ আর কী? চুসান নামে জাহাজটিতে করে দেশে ফেরার পথেই *পথের পাঁচালীর* প্রথম খসড়া তৈরি।

শিল্পকর্মে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকতার ছাপ রাখার প্রধান শর্ত হল দেশজ ভাবধারা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজস্ব বোধকে অবলম্বন করে প্রকাশ মাধ্যমের রীতি-প্রকরণকে বাছাই করা। সত্যজিৎ রায় তখনকার সময়ের দেশি বিদেশি ছবির খোঁজ খবর রাখতেন, এবং সে সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনাও যথেষ্ট। তিনি বুঝেছিলেন যে শিল্পের অন্য শাখায় ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এই নবীন শিল্পমাধ্যমটিতে অনেক নতুন কিছু করার সুযোগ আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, নাট্যকলা ও সাহিত্যে ভারতীয়ত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, একমাত্র চলচ্চিত্রে এর বিকাশ অপূর্ণ। তিনি চাইলেন এ ক্ষেত্রে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আনন্দ থেকেই বিশ্বভুবনের উৎপত্তি— যে আনন্দ সমস্ত সুখ-দুঃখ নিয়ে, অথচ সুখদুঃখের অতীত। সকল শিল্পকলার মূল লক্ষ্য এই দিকে। কবিতা, চিত্র, গান, নাচের মতো চলচ্চিত্রেও সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে তার আপন ছন্দে প্রকাশ করতে হবে। পরবর্তীকালে পৃথ্বীশ নিয়োগীর সঙ্গে শিল্পবিষয়ে কথোপকথনে

দেখতে পাই দেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর টান। গাছ যেমন প্রাণশক্তি পায় মাটিতে পোঁতা শিকড় থেকে, শিল্পেরও শিকড় ছড়িয়ে আছে দেশের মৃত্তিকার গভীরে। তাই প্রথম ছবিতেই তিনি কোনও অতিকথনের মধ্যে না গিয়েও পল্লিজীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করলেন, নিপুণভাবে বাছাই করা কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে— পল্লির সন্ধ্যাবেলার রূপ, মাঠজোড়া সীমাহীন আকাশ, দিগন্তবিস্তীর্ণ কাশবন, উজাড় করে দেওয়া বৃষ্টির সৌন্দর্য। এর পাশাপাশি গ্রামের মানুষের ব্যবহারিক ক্ষুদ্রতা, তার পাশে সহানুভূতি, রুক্ষ কর্কশ ব্যবহারের পাশে স্নেহময় মাতৃত্ব, আশায় গড়ে ওঠা দিনের পাশে দারিদ্রের নিষ্করুণ প্রকাশ, বাঁচার ইচ্ছার পাশে মৃত্যুর হাতছানি। 'হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে/কাঁপে ছন্দ ভালো মন্দ, তালে তালে/নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে/তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।' জীবনের এই ছন্দোময় প্রকাশ *পথের পাঁচালীর* পরও সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবির মূল সুর রচনা করেছে। তিনি এ ছবির জন্য মাধ্যমটির প্রয়োগগত দিককে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবলেন: পাশ্চাত্য সংগীতের প্যাটার্নকে অবলম্বন করে নয়, ভারতীয় মার্গসংগীতের উপর নির্ভর করে। এইখানেই, এই ছবিতে রবিশঙ্করের স্মরণীয় ও আশ্চর্য অবদান। আমরা আজও *পথের পাঁচালী*-কে মনে রাখি ছবির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যপ্রকাশের কাব্যময়তা, বিষয় উন্মোচনের সহজ সরল ভাবের জন্য। সেই সঙ্গে নিঃসন্দেহে রবিশঙ্করের বাজনার লৌকিক প্রকৃতির সহজ ও আন্তরিক প্রকাশের জন্য। [*পথের পাঁচালীতে* শুধু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছিল। সেগুলি হল: সেতার, দিলরুবা, ভীমরাজ, সরোদ, পাখোয়াজ, তার সানাই, বাঁশি, গুপিযন্ত্র, চমং (তারের ঝাঁঝ) আর কাচারি।] এ ছবিতে পল্লিজীবনের দৃশ্যাবলি যেন আমাদের ধরাছোঁয়ার সীমার মধ্যে এসে পড়ে। রূপ ও বর্ণের সঙ্গে যেন মাটির সোঁদা গন্ধও নাকে এসে লাগে। এ সব সম্ভব হয়েছে সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা চালনায় ব্যবহারিক দক্ষতার জন্য। ছবি তৈরির ব্যাপারে বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর সত্যজিৎ ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। দুজনেই চিত্রশিল্পী ও প্রয়োগধর্মী শিল্পী। তাই বংশী চন্দ্রগুপ্তের কাজ আর সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা মিলেমিশে এক হয়ে বাস্তবতার এক ঘন সংবেদ্য প্রকাশ ঘটিয়েছে এই ছবিতে।

১৯৫৫ সাল। আমরা তখন কিশোর। *পথের পাঁচালী* ছবিটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কুড়ি ফুট বাই আট ফুট একটি বিশাল বিজ্ঞাপন, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় বিলবোর্ড, তার মাধ্যমে। ঠিক চৌরঙ্গির চার রাস্তার সঙ্গমস্থানে। ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড আকারের বিজ্ঞাপন প্রচারচিত্র, তাতে তুলির টানে ছন্দোময় ভাবে লেখা *পথের পাঁচালী*। শব্দ ক'টি যেন রেখার বাধাকে অতিক্রম করে অনির্দিষ্টের দিকে উড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর বর্ষাকালের কালো বিশাল একখানা মেঘের নীচে

প্রাণচঞ্চল দুটি ছেলেমেয়ের ছুটে যাওয়ার আনন্দময় প্রকাশ। সিনেমার বিজ্ঞাপন যে এমন হতে পারে তখন তা ছিল আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। হিসেবি লোকের সাধারণ চোখে মনে হবে স্পেসের কী অপচয়! পাত্র-পাত্রীর পরিচয় বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি কিছু নেই। থাকবেই বা কী করে? কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণাদেবী ও রেবাদেবী চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও খুব জনপ্রিয় নন। চুনিবালার বহুদিন যাবৎ এ জগতের সঙ্গে কোনও যোগসম্পর্ক নেই। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, *জনান্তিক* ও *প্রতিধ্বনি* নামে সলিল চৌধুরীর দুটি নাটকে অভিনয়ও করেছেন ১৯৫০ সালে। তবে এঁদের কারওই প্রচারমূল্য এমন নয় যে ছবির বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা জরুরি হয়ে পড়বে। যাই হোক, এই ছবিটি যে একটু স্বতন্ত্র ধরনের হবে ওই বিজ্ঞাপন তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ছবির মুক্তির আগে বেশ কিছু দিন ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো এমন নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত করতে ও নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তার করতে সাহায্য করেছে। অপু আমাদের খুব প্রিয় চরিত্র। আমরা তখনও তার মতো অবাক হই, বিস্ময় বোধ করি, স্বপ্ন দেখি। আমরা সবাই তখন আশায় বুক বেঁধে ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মশগুল। ভারতবর্ষ মাত্র কয়েক বছর হল স্বাধীন হয়েছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তখন তার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ গতিহীন। পরিসংখ্যান রায় দেয় যে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক গতির চাকা ঘুরছিল উল্টো দিকে। স্বাধীনতার কিছু দিন আগে, ১৯৪৩ সালে, এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়তে হয় দেশকে। বাংলায় ওই কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রায় তিরিশ লাখ লোক প্রাণ হারায়। এর জের কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশবিভাগ বাঙালির জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। জাতীয় জীবনে এই উপর্যুপরি দুর্গতির ফলে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে যায় দ্রুত। যৌথ পরিবারের বাঁধন ভেঙে নিছক অর্থনৈতিক কারণে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার মুখগুলি হয়ে ওঠে প্রকট। অখণ্ড বাংলার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ার জন্যও বিপুল সংখ্যক হিন্দু বাঙালি এই বাংলায় জড়ো হয় উদ্বাস্তু হিসেবে। তথাকথিত কোমলপ্রাণ, অলসচিত্ত বাঙালি এই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে কীভাবে নিজেদের পুনর্বাসন ও নবজীবন গড়ে তুলেছে সে হল পঞ্চাশের ইতিহাস। বাংলার এই পূর্বকথা হল *পথের পাঁচালী* ছবিটির প্রেক্ষাপট। দেশের স্বাধীনতা লাভ, যে রকমই হোক না, মানুষের মনের রুদ্ধ আবেগকে অনেকটা মুক্ত করে দেয়। সেই মনের ভাব নিয়েই চারিদিকের হতশ্রী অবস্থার মধ্যেও আমরা ডাক শুনেছি তখনকার সরকারের— পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,

পঞ্চশীল নীতি, মুদ্রার দশমিকীকরণ, নানা পদক্ষেপে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান। পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগজনিত সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকরা দৃঢ় সংকল্পে স্থির, এক সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় স্বাধীন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার, যা কিছু জীর্ণ পুরাতন অক্ষম, তা ভেঙে ফেলার। এমন পরিস্থিতিতে *পথের পাঁচালীকে* আমরা স্বাগত জানিয়েছি মুক্ত চিত্তে। নিজেদের ভাবনা আশা কল্পনা আর ইচ্ছাকে রূপায়িত করার বাসনায়। নাট্য আন্দোলন এগোচ্ছে জোর কদমে। গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন তখনও প্রবলভাবে দানা বাঁধেনি। বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* সকলকে চমকিত করেছে আর *বহুরূপী* দল একের পর এক নতুন নতুন প্রযোজনায় ধারাবাহিক ভাবে আমাদের রুচি বদলের কাজ করে যাচ্ছে। কষ্ট করেও ভাঙা মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী করে যাচ্ছেন তাঁর শেষ অভিনয়গুলি। অন্য দিকে শিল্পসাহিত্য নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সাহিত্যপত্রের জোয়ার তখন। *চতুরঙ্গ, পরিচয়, কবিতা, পূর্বাশা, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য, সুন্দরম*-এর মতো পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সব মিলেমিশে সাংস্কৃতিক জগৎকে মাতিয়ে রেখেছেন শিল্পী সাহিত্যিকেরা। সে তুলনায় একমাত্র চলচ্চিত্রেই তেমন উৎসাহব্যঞ্জক কিছু হচ্ছিল না। যদিও মোটমুটিভাবে বলতে গেলে চল্লিশের দশক থেকে বাংলা ছবিতে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই বিষয়বস্তুতে সমাজচেতনা, তারকাপ্রথা অগ্রাহ্য করে আনকোরা নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করায় আর সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত চিত্রনাট্য ও কাহিনি বিন্যাসের ঢং থেকে। তবে সে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু'-একটি ছবিতেই। তখনকার দিনে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ছবি *উদয়ের পথে*। দেশাত্মবোধের আবেদন দেখা যায় *ভুলি নাই, ৪২*-এ। *বসু পরিবার, সাড়ে চুয়াত্তর* চিত্রোপযোগী গুণে উতরে যাওয়া ছবি। নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* আর একটি সাড়া জাগানো ছবি। এমন কয়েকটি হাতে গোনা ছবির প্রচেষ্টা দেখা গেলেও প্রধান লক্ষ্য ছিল দর্শকের মামুলি প্রথায় মনোরঞ্জনের। বিষয়বস্তুর গভীরতায় এবং চরিত্র ও পরিবেশের ব্যঞ্জনাময় ডিটেলসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রধর্মী প্রকাশের ফলে ছবিও যে স্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে এ-রকম গভীর চিন্তা বা নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টা কারও মধ্যে দেখা যায়নি। সে হিসেবে *পথের পাঁচালী* ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে এক সুস্পষ্ট দিকচিহ্ন। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের পৌনঃপুনিকতার অবসান ঘটিয়ে এই ছবির আবির্ভাবের পর বাংলা ছবি তার রূপৈশ্বর্য খুঁজে পেল। যে কোনও যুগান্তকারী সৃষ্টির পেছনে এক নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পরম্পরা লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্র যেহেতু বিশ্বজনীন শিল্পমাধ্যম, তাই এর ভাষার বিকাশের পরিক্রমার চিহ্ন পাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য চিত্রসৃষ্টির প্রচেষ্টায়। গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন,

চ্যাপলিন, দোভজেঙ্কো, পুদভকিন, দনস্কয়, অরসন ওয়েল্‌স, রেনোয়া, ডি সিকার সৃষ্টিতে যে ভাষার বিকাশ, তারই উত্তরসূরি এই *পথের পাঁচালী*। তবে, এর বৈশিষ্ট্য হল: বিন্যাসে ভারতীয় শিল্পপ্রকরণের ছাপ, যা বিষয়ের সঙ্গে মিলে এক অনাস্বাদিত কাব্যিক অনুভূতির সঞ্চার করে। এমন ছন্দে এমন রূপে পরিচালক তাঁর নিজস্বতার প্রকাশ ঘটালেন, যার মৌলিকত্বে সারা দুনিয়া স্তম্ভিত ও অভিভূত। বিশ্বের মানচিত্রে সকল ভারতীয়ত্ব নিয়ে হাজির হল একটি বাংলা চলচ্চিত্র, চরম আর্থিক দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে যেটি তৈরি। কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে মোটেই দীনহীন নয়, বরং অহংকারী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সত্যজিৎ রায় নিজেও সে কথা বলেন, "আমার প্রথম ছবি *পথের পাঁচালী* যে ভীষণ অন্যরকমের কিছু হবে, তা নিয়ে আলোচনা বিতর্ক হবে তা আমি জানতাম। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই ছবিটা করেছিলাম।" *পথের পাঁচালী* আমাদের আশাকে সীমাহীন করার সাহস জুগিয়েছে, নতুনত্বের প্লাবন এনে দিয়েছে— সেই জোয়ারেই চলে এল এক সঙ্গে একরাশ নতুন ভাবনার পরিচালক। ঋত্বিক ঘটক সমাজ-সচেতনতায় তাঁদের মধ্যে পুরোধা ও বলিষ্ঠ।

১৯৫৫। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মারা যান এ বছর। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক ও দর্শনমনস্ক বৈজ্ঞানিক। সময় ও আলো সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে তিনি সম্পূর্ণ পালটে দেন। লক্ষণীয়, চলচ্চিত্রেও সময় ও আলোর ব্যবহার করতে হয়, যদিও, ভিন্ন কায়দায়— শৈল্পিক নিয়মে। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবর্ষ পূর্ণ হল। সত্যজিৎও ছিলেন এই কলেজের ছাত্র। দেশের বহু প্রতিভাধর মানুষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানে। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের তাগিদে হিন্দু বিবাহ আইন প্রণয়ন হল পার্লামেন্টে। আর কলকাতায় ৪টি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হল *পথের পাঁচালী*। ২৬ অগাস্ট ১৯৫৫। অনেক দর্শক এমন একটি ছবিকে গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত ছিল। সেটা নিতান্তই ছবি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে। আবার অনেকের কাছে এ ছবিটি বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল। এও ছবি সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশার মাপকাঠিতে ও শিল্প সম্পর্কে সামগ্রিক বোধের ভিত্তিতে। এ ছবি নিয়ে যত লেখা হয়েছে হয়তো আর অন্য কোনও ছবি নিয়ে ততটা হয়নি। দেশে বিদেশে এ ছবি কী রকম হইচই ফেলেছিল তার খবর প্রায় সকলেরই জানা। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে আসার পরও তার আবেদন কি কিছু কমেছে! এতটুকু না। বরং কালজয়ী শিল্প হিসেবে বারবার এ ছবিটিকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে মানুষ। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরে পঁচাত্তর বছর পার হয়ে এসেছে।

উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন '*পথের পাঁচালী* আখ্যানটি অত্যন্ত দেশী।... বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' সত্যজিৎ বইখানিকে 'বাংলার গ্রামজীবনের বিশ্বকোষ' বলে মনে করেও তিনি শুধু বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছিলেন না। কেননা তাঁর প্রকাশমাধ্যম ভিন্ন। তিনি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিতে গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যে মানবজীবনের সেই চিরন্তন সত্যটিকে চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রতিফলিত করলেন। উপন্যাসটির বর্ণনাভঙ্গির ঢিলেঢালা মেজাজের মধ্যে ফুটে ওঠে গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ মন্থর ছবি। সত্যজিৎ ছবির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলে মূল বইয়ের অনেক বাগবিস্তারকে বর্জন করে ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নেন এমনভাবে যাতে ছবির কাহিনিতে একটা নতুন বুনট তৈরি হয়। সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন '*পথের পাঁচালী* উপন্যাসের বারো আনা ঘটনাই ছবিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি; সেই সঙ্গে চরিত্রও বাদ পড়েছিল অজস্র।' উপন্যাসের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় শ'তিনেক চরিত্র থেকে তিনি বেছে নেন বড় জোর ত্রিশটি চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনিতে তথাকথিত কোনও নাটকীয় পরিণতি নেই বলে ছবির ঘটনাবিন্যাসে ভাবের বৈপরীত্য এনে কাঙ্ক্ষিত সংঘাত ফুটিয়ে তোলেন। যাতে গল্পটা এগিয়ে চলার জন্য একটা নির্দিষ্ট গতি পায়। টুকরো টুকরো ঘটনাক্রম সাজিয়ে একটা গল্প বলা গেলেও দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য কাহিনির নিস্তেজ ভাব কাটিয়ে এমন কিছু উপাদান আনা চাই যাতে তাদের আগ্রহ অটুট থাকে। তাই, ছবিতে ইন্দির ঠাকরুনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় অনেকটা সময়।

অন্য দিকে, ছবির জন্য বেছে নেন এমন একটি ভাষা, যে ভাষায় বললে বাংলার গ্রামজীবনের অন্তরাত্মাকে অবিকলভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। নিঃশব্দ গ্রামীণ পরিবেশের রহস্য— যেখানে শুধু শোনা যায় একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, চোখের সামনে মেলে ধরে ভোরের আলোর উজ্জ্বল ভাব, সন্ধ্যাবেলার বিষণ্ণতায় ভেসে আসে শাঁখের আওয়াজ, ঘনিয়ে আসে অন্ধকারে পুকুরের জলে গাছের গভীর ছায়া, ধোঁয়ায় ঢাকা কুটিরের চালে গাছের ডালে জমে থাকে কুয়াশার আস্তরণ, বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার ব্যঞ্জনায় রহস্যময় হয়ে ওঠা আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ অজানা ঠিকানার দিকে চলে যায়, বর্ষা আসার আগে ধূসর গুমোট ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শব্দহীন এক স্থিরতা— এ সব কিছুর অনবদ্য রূপকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন ছবির অবয়বে।

উপন্যাসের বহু ঘটনা বহু চরিত্রকে কাটছাঁট করে নিয়েছেন নিছক ছবির প্রয়োজনে, অথচ সময়ের ব্যবহারে লক্ষ করি এক ছন্দোময় নিস্তরঙ্গ ভাব। চিনিবাস ময়রার দৃশ্যটির কথাই ধরা যাক। উপন্যাসের মাত্র কয়েক লাইনের বর্ণনাকে আনেন

প্রায় দেড় মিনিট সময় ধরে। পুকুর পাড় দিয়ে বাঁকে করে মণ্ডা-মিঠাই নিয়ে চলেছে সে। তার চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেতারে ও গুপিযন্ত্রে বেজে ওঠে ছন্দোময় সুর। পেছন পেছন চলে দুর্গা ও অপু। সঙ্গে একটি কুকুর। সমগ্র দৃশ্যটি প্রতিফলিত হয় পুকুরের জলের আয়নায়। বা সমস্ত আকাশ জুড়ে যখন প্রথম বৃষ্টি আসে, সেই আনন্দে পুকুরের জলে জলপোকারা নাচানাচি শুরু করে, পদ্মপাতায় হইচই পড়ে যায়। শালুক, শুকনো ডালে, কলমীলতার পাতায় পাতায় গঙ্গাফড়িংরা উড়ে উড়ে এসে বসে, জলে ছোট ছোট ঢেউ তৈরি হয়— প্রাণছন্দের স্পর্শে সমগ্র দৃশ্যটি যেন কথা বলে ওঠে। এই দৃশ্যটিরও পর্দায় স্থায়িত্বকাল হল ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। মন্থর গতির ছবি বলে *পথের পাঁচালী* সম্পর্কে অপবাদ উঠতে পারে এমন অভিযোগের কথা মাথায় রেখেও এই সব দৃশ্যকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে পরিচালক ছবির বুনটের মধ্যে গেঁথে নেন। তিনি জানতেন ক্যামেরার সচলতার উপর ছবির গতি নির্ভর করে না। বরং ক্যামেরাকে স্থির করে রেখেও মুহূর্তকে গতিশীল করে তোলা যায় যদি দৃশ্যের অন্তর্গত টেনশন পর্যাপ্ত পরিমানে টানটান থাকে। তবে নজর রাখতে হবে দৃশ্যের স্থায়িত্ব যেন বিন্দুমাত্র সময়ের জন্যও মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, আর সেইসঙ্গে দৃশ্যের শব্দময়তা (তথ্যপূর্ণ সংলাপ বা সংকেতময় সংগীতের সাহায্যে) দর্শকের কানকে যেন সজাগ রাখতে বাধ্য করে। তাই বর্ণিত দৃশ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলেও ছবির সঙ্গে এরা অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে পড়ে কেননা এই সব রূপময় দৃশ্য নিয়েই, এই সব দৃশ্যের মধ্যেই বাংলার পল্লিগ্রামের অন্তরঙ্গ রূপটি ধরা পড়ে, তাই ছবির পক্ষে নিতান্ত জরুরি একটি আমেজ তৈরি করে। বরং আমাদের ২ মিনিট ৪২ সেকেন্ড ধরে চলা যাত্রা-পালার দৃশ্যটিকে একটু দীর্ঘায়িত মনে হয়।

ছবির সময়ের সঙ্গে কাহিনির সময়কেও তিনি ব্যবহার করেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে। ছবির প্রথম দৃশ্য থেকেই আমরা জেনে যাই সর্বজয়া অন্তঃসত্ত্বা। এর পর আসে ইন্দিরের খাওয়ার দৃশ্য ও দুর্গার পাশে বসে থাকা, ফল চুরিকে কেন্দ্র করে সর্বজয়ার ইন্দিরকে শাসানো। মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে দুর্গার উঠোন ঝাঁট দেওয়া। গালমন্দে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দিরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, দুর্গার পীড়াপীড়িতেও বাড়ি না ফিরে বাঁশবনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। এর পরেই আসে প্রসবের দৃশ্য। হরিহরকে ছবিতে দেখা যায় এই প্রথমবার। পরের দৃশ্যে দাওয়ার এক প্রান্তে ইন্দির ঠাকরুন পা ছড়িয়ে বসে পাঁচ-ছ'মাসের বাচ্চা অপুকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে দোলনা দোল খাওয়াচ্ছে, অপর প্রান্তে খেলনা বাক্স নিয়ে দুর্গা আপন মনে খেলছে। অন্য দাওয়ায় সর্বজয়া ও হরিহরের দাম্পত্য জীবনের একটি সুখময় মুহূর্তের ছবি। আমরা

জানতে পারি তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তার পরই এক লাফে ছ'বছর সময় পার করে অপুর পাঠশালায় যাওয়ার দৃশ্য। সত্যজিৎ লিখেছেন, 'অপুর পাঠশালায় যাওয়ার দিন থেকে শুরু করে দুর্গার মৃত্যু অবধি এক বছর সময় কল্পনা করে চিত্রনাট্যের ঘটনাগুলিকে ঋতু অনুসারে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল।' এই দৃশ্যটিতে পৌছনোর আগের দৃশ্যগুলির মাধ্যমে সত্যজিৎ যেন পরবর্তী ঘটনার জন্য উপযুক্ত একটি পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করে নেন। ছবিতে আসল কাহিনি শুরু হয় এর পর থেকে, তাই এ পর্যন্ত কাহিনির সময় পার হয়ে যায় দ্রুত।

শুধু বছরের হিসেবে নয়, দিনের হিসেবেও সত্যজিৎ ঘটনাকে সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা-রাত্রির দৃশ্যে ভাগ করে নেন। এতে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের টুকরোগুলোকে জুড়ে দর্শকের মনে গোটা দিনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সূত্র ধরেই তাঁর ছবিতে আসে খাওয়ার দৃশ্য। যেটা বাস্তবসম্মত ও কার্যকর ডিটেল হিসেবে চরিত্রগুলির দৈনন্দিন জীবনযাপনের পুরো চেহারাটাকে ফুটিয়ে তোলে।

দৃশ্য রচনায় বিমুগ্ধ ভাবের পাশাপাশি তিনি জোর দিলেন প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতের ওপর। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে একটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে গ্রামের মধ্যে, গ্রাম থেকে। আর সে জন্য তারা গ্রামছাড়া হযে যাচ্ছে। কালের অমোঘ নিয়মে মানুষের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাই মানুষকে সনাতন জীবনযাত্রার কেন্দ্র থেকে ছিটকে ফেলে অন্যত্র, এ যেন এক অদৃষ্ট নিয়তির খেলা। *পুতুল নাচের ইতিকথা* মনে পড়ে যায় এই সূত্রে।

ছবির *পথের পাঁচালী*-কে আমি অপুর পাঁচালী বলব না। বরং এ ছবি ইন্দির ঠাকরুনের, সর্বজয়ার, দুর্গার। অপু এখানে দর্শক মাত্র— যে এই জটিল রহস্যময় নিষ্ঠুর জগৎকে দেখেছে শিশুমন দিয়ে। ছবিতে তার ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। তার অবাক করা চোখে সে দেখছে প্রকৃতি, নিসর্গ, রেলগাড়ি, কাশবন আর চেনাশোনা মানুষদের। উপভোগ করে সে মায়ের স্নেহ, বাবার প্রশ্রয় আর দিদির শাসন জড়ানো ভালবাসা। প্রদীপের ম্লান আলোতে পিসির কোলের কাছে শুয়ে সে রূপকথার গল্প শোনে, দিদির সঙ্গে সোনাডাঙার মাঠ আর ধানখেত পেরিয়ে অচেনা জায়গায় বেড়াতে যায়, রেলগাড়ির রহস্য তাকে টানে। টেলিগ্রাফের তারের খুঁটিতে ভেসে আসা রহস্যময় শব্দ শুনে কল্পনায় ভর করে চলে যায় জগতের শেষ সীমায়। যার পর শুরু হয়েছে অজানার দেশ, অসম্ভবের দেশ। সে বিশ্বাস করতে চায় না দিদি পুঁতির মালা চুরি করেছে। দিদির মৃত্যুর পর লুকানো জায়গা থেকে সেটা বের হওয়া মাত্র ছুড়ে পাঠিয়ে দেয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। পুকুরের জলে মালাটাকে বিসর্জন দিয়ে অপুর মনে দিদির স্মৃতির গোপন কক্ষটিকে আড়ালে রাখার কাতরতাই স্পষ্ট

হয়। বালক অপু যেন সেই মুহূর্তে বয়স্ক হয়ে ওঠে। তবু সে *পথের পাঁচালীর* প্রধান চরিত্র না। তবে কে? অনেকে বলবে গ্রাম বাংলা। তাও না। গ্রাম বাংলা শুধুই প্রেক্ষাপট, তার সৌন্দর্য আর নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এই ছবির প্রধান চরিত্র মানুষেরা। একে একে এক-একটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। এক সময় মনে হয় ইন্দির ঠাকরুন এ ছবির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রকে পরিচালক তাঁর ছবির বিন্যাসে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। অস্তিত্ব নিয়ে সংকট আর আশ্রয়হীনতা ছবির বিষয়ের একটা দিক হিসেবে ভাবা হলে ইন্দির ঠাকরুন তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে', মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান এই দীন মানুষটি জীবনের শেষ ক'টি দিনের জন্য আশ্রয় চায়। সব খুইয়েও যেন আত্মসম্মানের তলানিটুকু নিয়ে বাঁচতে পারে। তাই সম্বলহীন নিঃসহায় নিরাশ্রয় মানুষটির ঠাঁইয়ের জন্য এত আকুতি।

সত্যজিৎ রায় এই ছবিতে বেশির ভাগটাই বিভূতিভূষণের সংলাপ ব্যবহার করেছেন। বিন্যাসে রদবদল থাকলেও অধিকাংশ ঘটনাকেও সাজিয়েছেন উপন্যাসেরই অনুসরণে। তবে ছবির দৃশ্যকল্পে সমকালীন রূঢ় বাস্তবতার নির্মম রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব ভাবনায় ও চলচ্চিত্রের নিজস্ব চিত্রভাষায়। বিশেষ করে ইন্দির ঠাকরুনের দৃশ্যগুলিতে। ছবিতে ইন্দিরের বাড়ি ফিরে আসার শেষ দৃশ্যটির কথাই ধরা যাক। কয়েক দিন ধরে ইন্দিরের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। রোজই বিকেলে জ্বর আসে। বুঝতে পারে, হয়তো দিন ফুরিয়ে আসছে। জীবনের শেষ ক'টা দিন নিজের ভিটেমাটিতে কাটাবে বলে রাজুর বাড়ি থেকে চলে এসে সর্বজয়ার কাছে আশ্রয় চায়। লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির দরজা খুলে ঢোকে। দরজার কেঠো কর্কশ আওয়াজটা আর্তনাদে যেন ককিয়ে ওঠে। এ কি তার ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিণতির পূর্বাভাস? সর্বজয়া তখন রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে। দৃশ্যটিকে আরও নিষ্ঠুর করে তোলার জন্য পরিচালক বেছে নেন সর্বজয়ার খাওয়ার সময়কে।

ইন্দির : বউ। বউ আছিস?

গাছের ডালে তার চাদরের খুঁট জড়িয়ে যায়।

সর্বজয়া : তুমি কী মনে করে?

একগাল হাসি নিয়ে ইন্দির এগিয়ে আসে। বলে—

—শরীরডা তেমন ভালো ঠেকছে না— তাই মনে করলুম শেষ ক'টা দিন এই ভিটেমাটিতে—

সর্বজয়া : তোমাকে আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না। ভিটের কথা ভেবে তোমার ত ঘুম নেই। তুমি বিদেয় হও— না হলে আমি অনর্থ করব—

এ কথা শুনে ইন্দিরের শেষ আশাটুকু মিলিয়ে যায়। তবু নিজের দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসে। বলে—

দাঁড়া বাপু, দাঁড়া—

দাওয়ায় তার সম্বলটুকু— লাঠি, ঘটি, পুঁটলি আর মাদুর রাখে। ক্লান্ত শরীরে বসে সে হাঁপায়।

সর্বজয়া : বসলে নাকি?

ইন্দির : (হাঁপায়) দাঁড়া বাপু। একটু জিরিয়ে নিই।

(এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটির অন্তবর্তী সময়ে ক্যামেরা চলে যায় কাশবনের মধ্যে, পিসির দুটি প্রিয় শিশু— অপু-দুর্গার আখ খাওয়ার আনন্দোচ্ছল দৃশ্যে) ইন্দির মুখ মোছে। দাওয়ায় বসে তখনও হাঁপায়।

সর্বজয়া : ঠাকুরঝি? ঠাকুরঝি, ঘুমুলে নাকি?

ইন্দির : একটু জল দিবি?

সর্বজয়া : গড়িয়ে খাও না। ঘটি আছে ত।

খুব কষ্ট করে ঘটি হাতে ইন্দির দাওয়া থেকে নামে। উঠোন পেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে সিড়ি বেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় ওঠে। সর্বজয়া তাকে লক্ষ করে। তার পর হাত বাড়িয়ে কলসির ঢাকনা খুলে দেয়। সমস্ত পর্দা জুড়ে ইন্দিরের মুখ। মুখে করুণ হাসি। যেন আশ্রয়ভিক্ষার্থীর শেষ প্রার্থনা। সর্বজয়ার গম্ভীর মুখ দেখে সে হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। ক্যামেরা ইন্দিরের মুখের উপর স্তব্ধ। নেপথ্যে সেতার বেজে ওঠে। ইন্দির কলসি থেকে ঘটিতে জল গড়িয়ে নেয়, খানিকটা খায়, খানিকটা মাথায় দেয়। তার পর নিজের দাওয়ায় ফিরে আসে। ঘটি থেকে বাকি জলটা উঠোনে গাছের গোড়ায় ঢেলে দেয়। তার হাতে পোঁতা গাছটা এখন অনেক বড় হয়েছে। সেটাকে সে লালন করে নিজের তেষ্টার জলের কিছুটা দিয়ে, নিজের জীবনটাকে পারে না। সমস্ত পর্দা জুড়ে মিড ক্লোজ শট ইন্দিরের অসহায় অবস্থার শূন্যতাকে প্রকট করে তোলে। ধীরে ধীরে সে তার জিনিসপত্র তুলতে থাকে। সর্বজয়া খাওয়া বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। ইন্দির তার ঘরের দিকে একবার চেয়ে দেখে। সর্বত্র ছন্নছাড়া হতশ্রী চেহারা। দাওয়ায় কুকুরটা এসে আশ্রয় নিয়েছে। শেষবারের মতো ভিটে ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষটি শূন্য মনে আশ্রয়হীন অবস্থায় অজানার উদ্দেশে চলে যায়। সেতারে বাজনা ক্রমে মিলিয়ে যায়।

সর্বজয়াও দারিদ্রের শিকার। সে ছাড়া আর বাকি তিনটে মুখের অন্ন জোগাতেই সে দিশেহারা। তার কাছে আর একটি মুখের অন্ন জোগানো যেন বাড়তি বোঝা। অবস্থাই তাকে হীনমনা করে তুলেছে। নিষ্ঠুর আচরণ যেন না-খেতে পাওয়ার মতো

অবস্থায় পড়ার আশঙ্কার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাই ইন্দির ঠাকুরুনের স্থান হয় না। মৃত্যুর জন্য তার একটু আশ্রয়ও জোটে না। মরে বাঁশবাগানে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্নেহ মমতা তো দূর অস্ত। (পঞ্চাশের দশকের বাংলার অবস্থা ছিল এমনই) ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর বীভৎসতা অপু-দুর্গাকে হতবাক করে। জবুথবু ভাবে বসে থাকার অপ্রাকৃতিক ভাব তাদের ভয় দেখায়। অপুর চোখে তখনও বিস্ময়ের ছোঁয়া। দিদির ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া দেখেই সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বালক-বালিকা দুটির কাছে মৃত্যুকে চাক্ষুষ করার প্রথম অভিজ্ঞতা আসে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের ছন্দপতনের মতো। মৃত মানুষটির শরীর যখন জড়বস্তুর মতো শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার শেষ সম্বল ঘটিটি ধাতব শব্দ করতে করতে গড়িয়ে যায় পুকুরের জলে। অপু-দুর্গা দৌড়ে ছুটে আসে জীবনের কাছে মৃত্যু দর্শনের ভয়াবহতাকে নিয়ে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, বাঁশগাছের ঘষটানির মর্মর শব্দ, নেপথ্য বাজনার মৃদু একঘেয়ে আওয়াজ দৃশ্যটিকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে।

দুর্গা এ-ছবিতে দাপিয়ে বেড়ায়। তার উপস্থিতি ছবিতে একটা গতি এনে দেয়। তার প্রাণোচ্ছল প্রকৃতি কোনও আবরণ, কোনও সামাজিক বাছ-বিচার, ভালমন্দ মানে না। সে চুরি করে, হ্যাংলামি করে। প্রাণের উচ্ছলতায় সে সব কিছু উপভোগ করতে চায়। ভালো-অবস্থা খারাপ-অবস্থার ভেদাভেদ সে জানে না। মনেও আসে না। সেটা বড়রা করে। তাই সে স্বীকার করে না তাদের দীন-অবস্থাকে। পেড়া খাবার ইচ্ছায় সে ছুটে যায় ভাইকে নিয়ে চিনিবাস কাকার পেছন পেছন। মুখুজ্যে গিন্নি, সেজবউয়ের মুখঝামটা সহ্য করেও সে-বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলে অনায়াসে, হয়তো খাওয়ার লোভে। পুঁতির মালাটা তার এত পছন্দ যে সেটাকে পাওয়ার জন্য চুরি করতেও পেছপা হয় না। এই পুঁতির মালা চুরির সময় দুর্গার মনে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির সহজ ইচ্ছে যতটা থাকে, পাপের কলুষ ততটা থাকে না। তাই দুর্গার মনে কোনও গ্লানিবোধ স্পর্শ করে না। বাড়ির লোকের তাকে লেখাপড়া শেখানোর কোনও আগ্রহ নেই বা ভাইয়ের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারের পার্থক্য তার মনে কোনও অভিযোগ তোলে না। পিসিকে ছাড়া তার একদণ্ড চলে না, তার জগতে পিসির আশ্রয় নির্দিষ্ট। সে ফল চুরি করে আনে পিসিকে খাওয়ানোর জন্য, বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গেলে পিসিকে জোর করে ডেকে আনতে যায়, পিসি বাড়ি ফিরে এলে সে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। বাড়ির সামান্য দুধটুকুরও ভাগ দেয় তার পোষা বেড়ালছানাকে। আচার খাওয়ার সঙ্গী করে ভাইকে, স্কুলে পাঠানোর সময় চুল আঁচড়ে তাকে সাজিয়ে তোলে। পুণ্যিপুকুর ব্রত করে আর বন্ধুদের সঙ্গে চড়ুইভাতি। অপুকে নিয়ে কাশবনে বেড়াতে চলে যায়, রেলগাড়ির শব্দ তার মনকে

টানে, যদিও শেষ পর্যন্ত তার আর রেলগাড়ি দেখা হয় না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসে প্রাণভরে। এই দুরন্ত প্রাণবন্ত মেয়েটি *পথের পাঁচালী* ছবির সবচেয়ে আর্কষণীয় চরিত্র। তার মৃত্যুতে আমরা টের পাই ছবির আগাগোড়া সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে ছিল। আমরা কি এতক্ষণ তার প্রতি খেয়ালশূন্য ছিলাম? আমাদের নজর কি অপুর দিকে ছিল? হরিহরের আর্তনাদ আর সর্বজয়ার ভেঙে পড়ার মুহূর্তে আমরা অনুভব করি কাহিনির কতখানি হৃদয় জুড়ে ছিল এই কিশোরীটি। তাই তার মৃত্যু ছবির পরিণতির সূচনা করে। এর পর আর যেন কিছু বলার থাকে না। আমাদেরও আকর্ষণও ফুরিয়ে যায়। তার মৃত্যুশোক পরিবারকে গ্রামছাড়া করে।

পথের পাঁচালী ছবিটি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরের অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে দেশে বিদেশে সর্বত্র। এত সংখ্যক লেখা তাঁর আর কোনও ছবি নিয়ে হয়েছে কি না, অনুমান সাপেক্ষ। সত্যজিৎ রায় পরবর্তীকালে আরও দক্ষতার সঙ্গে ছবি তৈরি করলেও তাঁর নাম যেন আষ্টেপৃষ্ঠে এই ছবির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এর কারণ হয়তো এই যে, এমন একটা টাটকা তাজা ছবি যা প্রয়োগের সব চিন্তাকে তছনছ করে দিয়ে আমাদের সেই পঞ্চাশের দশকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো প্রাণমন মাতিয়ে দিয়েছিল।

পথের পাঁচালীর প্রস্তুতিকালীন কষ্টসাধনের কথা প্রায় কিংবদন্তি হয়ে গেছে। এ ছবির পুরস্কারের তালিকা সব চেয়ে দীর্ঘ এবং এ ছবির থেকে রোজগারের অংশটাও বেশ পুষ্ট। তবে কি একে সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে গণ্য করা হয়? সত্যজিৎ রায় অবশ্য বলেছেন *পথের পাঁচালীর* কয়েকটি দৃশ্যে ঠিক জায়গায় ক্যামেরা বসানো হয়নি বা উপযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা হয়নি বলে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, যেটা শোধরাতে হলে নতুন করে শুটিং করার দরকার হত। ছবিতে বৃষ্টির আগে কালবৈশাখী ঝড়ের দৃশ্য দেখানোর ইচ্ছে ছিল। অনিল চৌধুরী লিখেছেন, 'ঝড় এসে পড়ল। দুর্গা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অপু জানালা দিয়ে বইখাতা ফেলে দিয়ে তার পেছন পেছন ছুটল। এইখানে ঝড়ে আম পড়া অপু-দুর্গার আম কুড়োনোর দৃশ্য থাকার কথা ছিল। আর্থিক অভাবে বছরের ঠিক সময়টা বেছে নিয়ে ঝড়ের দৃশ্য তোলা সম্ভব হয়নি।' সত্যজিৎ রায়ও পরে আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'ওই রকম বৃষ্টি তো জুলাই-অগস্ট মাসে পড়ে। তা সেই সময়ে সরকারি দপ্তর ব্যস্ত ছিলেন আমাদের হিসেব পরীক্ষার কাজে। ফলে, পরের কিস্তিটা যখন এল, বর্ষাকাল তখন শেষ হয়ে গেছে।'

অনিল চৌধুরীর লেখায় আরও জেনেছি যে কাশবনের দৃশ্যে সত্যজিৎ রায়ের পরিকল্পনা ছিল খুব ভালো করে দেখানো যে অপু ট্রেন দেখতে পেল, দুর্গা পেল

না। ছবিতে 'কিন্তু দর্শক খুব ভালো করে বুঝতে পারে না যে দুর্গা ট্রেন দেখতে পায়নি। এর জন্য আর একদিন শুটিং করা দরকার ছিল। সেটা আমরা করতে পারিনি। এই ত্রুটিগুলো *পথের পাঁচালীতে* থেকে গিয়েছে, তার মূল কারণ আর্থিক। না হলে সত্যজিৎবাবু যা খুঁতখুঁতে লোক, আর খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে যতটা মনোযোগ, তাতে আর্থিক সঙ্গতি থাকলে ওই শটগুলো নিশ্চয়ই রিটেক করা হতো।'

একেবারে আনকোরা হাত, তার সঙ্গে চরম আর্থিক টানাটানি, তাই বারবার ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যাওয়ার জন্য হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, আবার টাকার জোগাড় হলে ছবির কাজ শুরু করা, এ রকম পরিস্থিতিতে ছবির মান কিছুটা তো খর্ব হবেই। তবু এ সব সত্ত্বেও *পথের পাঁচালী* শুধু বাংলা ছবির ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা আমাদের আজও মুগ্ধ করে, শতাব্দী জুড়ে আরও অসংখ্য মানুষকে মুগ্ধ করে রাখবে। আশা করি, তখনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে চিরকালীন অপুর দেখা মিলবে, যারা অবাক হতে পারে, যারা বিস্ময় বোধ করে, স্বপ্ন যারা দেখে। জ্ঞানের সীমা যাদের কল্পনার জগৎকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেনি। শিল্প যেহেতু সৃষ্টি, তাই জীবধর্মী। জীবের মতো তার অস্তিত্বের ধারা প্রবহমান কাল ধরে চলে। চিরায়ত শিল্পের এটাই লক্ষণ।

এই ছবির শেষ দৃশ্যে মুখুজ্যে গিন্নি সেজবউ সর্বজয়াকে বলে, 'বছরের পর বছর এক জায়গায় গুণ পুঁতে বসে থাকা— এ ভালো না ছোট বউ। এতে মানুষের মন বড় ছোট হয়ে যায়।' তাঁর শেষ ছবি *আগন্তুক*-এর শেষ দৃশ্যে মনোমোহন তার তৃতীয় প্রজন্মের বাবলুকে বলে, 'এইবার ছোট দাদু দেবে ছুট।... এবার তুমি আসবে আমার কাছে, আর কোন জিনিসটা কখনও হবে না, কথা দিয়েছ? কূপমণ্ডুক। মনে থাকে যেন।'

সীমাকে লঙ্ঘন করে বেড়িয়ে পড়ার এই ডাকটি শোনা যায় তাঁর প্রায় সব ছবিতেই।

মেমরি গেম— শুধু খেলা?

অরণ্যের দিনরাত্রি। একশো এগারো মিনিটের ছবির প্রায় সাতাত্তর মিনিট পার হয়ে গেছে। ছবিতে ঘটনা তখন নতুন দিকে বাঁক নিচ্ছে। ছ'টি প্রধান চরিত্র। চারজন যুবক, দুটি যুবতী। বন্ধু চারটি ভিন্ন মেজাজের। ধরনধারণ ও পেশায় আলাদা। যুবতী দুটি সামাজিক সম্পর্কে ননদ-বউদি। দুজনেই চাপা স্বভাবের। মার্জিত ও শহুরে। আর একটিও আছে— সে সাঁওতাল মেয়ে। স্বভাবে ও আচরণে খোলামেলা। মুখের কথা ও মনের আবেগকে আড়াল করতে শেখেনি।

ছবিতে ইতিমধ্যে ঘটনার অভিঘাতে চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে, এর পরিণতিতে সম্পর্কগুলি কোন কিনারায় গিয়ে পৌঁছুবে সেটা তখনও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই চার বন্ধুর সাজানো কথায় যখন সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা ধরা পড়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আসে মেমরি গেম-এর দৃশ্যটি। খেলার কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না। কথা ছিল, এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই মিলে আড্ডা মারবে, গল্পসল্প করে সময় কাটাবে। অসীমের কথায় উঠে আসে মেলার প্রসঙ্গ ('কাছাকাছি কোথাও মেলাটেলা হচ্ছে বুঝি?')। তার থেকে জুয়া— জুয়া থেকে তিন তাসের খেলা— খেলা থেকে মেমরি গেম। এই খেলার প্রস্তাব আসে জয়ার মুখ থেকে— যার স্মৃতিশক্তি সবচেয়ে দুর্বল। এই চার বন্ধুকে বাড়িতে যাওয়ার নেমন্তন্ন করতে গিয়ে ভুলে যায় রাঁচি যাওয়ার কথা ('ওঃ ঠিক ত একদম ভুলে গেছি')। গুলিয়ে ফেলে অসীম-সঞ্জয়ের নাম। অসীমকে ডাকে সঞ্জয়

বলে। সঞ্জয় ভুল ভাঙিয়ে দেয়— 'ও অসীম, আমি সঞ্জয়'। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলটা কি তার অবচেতন মনের সাড়া— পছন্দসই হয়ে ওঠা মানুষের নামটাই সচেতন মনে উঠে আসে? খেলতে বসেও নিজের স্মৃতির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ('ভীষণ ভুল হয়ে যায়— জানেন') জয়াকে তাই নির্ভর করতে হয় রিনির উপর। 'খেলাটা রিনি শিখিয়ে দেবে— এই রিনি আয় না।' রিনির স্মৃতির উপর শুধু বউদি না, বাবা সদাশিববাবুও নির্ভরশীল। 'গানের কথা মনে থাকে না— আমার মেয়ের মেমরির উপর নির্ভর করে আর কত-গান গাওয়া যায়।'

এই দৃশ্যটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় লিখেছেন 'ছবির মধ্যপর্বে, যখন কাহিনির সব ক'টি চরিত্রেরই অন্ততঃ বাইরের দিকটা আমরা চিনে ফেলেছি, তখন আসে মেমরি গেম খেলার দৃশ্যটি। ছ'টি চরিত্র তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো প্রায় তাদের অজান্তেই গড়ে উঠেছে, সেই সম্পর্ক তাদের কাকে কোনদিকে নিয়ে যাবে, তার আভাস দেওয়া হয়েছে এই খেলার দৃশ্যে। এখানে কোন কিছুই খুলে বলা হয়নি, এবং কোন সময়েই খেলা থামেনি, অথচ শেষ পর্যন্ত খেলা গৌণ হয়ে গিয়ে চরিত্রগুলির আচরণের ইঙ্গিতময়তাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।... খেলাচ্ছলে চরিত্র উদঘাটনের এই দৃশ্য আমার নিজের একটি প্রিয় দৃশ্য। দৃশ্যের আপাতলঘু মেজাজের পশ্চাতে যে অনেক চিন্তা, অনেক হিসাব রয়েছে. এটা রচয়িতা হিসাবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

প্রকরণগত দিক থেকে 'মেমরি গেম' খেলার ধরন চলচ্চিত্রে নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তোলার জন্য খুবই উপযুক্ত। স্থানিক সীমাবদ্ধতার জন্য ক্যামেরা চরিত্রগুলির খুব কাছাকাছি চলে এসে তাদের মনস্তত্ত্ব ও ব্যবহারিক খুঁটিনাটির মধ্যে প্রতিফলিত মনের ভাবের প্রতি দর্শককে মনোযোগী করে তুলতে পারে। আলোচ্য ছবিতে আবহসংগীত-বর্জিত সাত মিনিটের দৃশ্যটিও শব্দ ও নৈঃশব্দ্য, ক্যামেরার মৃদু গতিশীলতা বা স্থির হয়ে থাকা সময় সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে। প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন শুনতে পাই সময়কে পার করে দেওয়া ঘড়ির টিকটিক শব্দ। দৃশ্যটিতে ক্যামেরা চরিত্রগুলিকে ছেড়ে বাইরের কোনও দৃশ্যের দিকে নজর দেয় না, সারাক্ষণই আবদ্ধ থাকে চরিত্রগুলির উপর— ক্লোজ বা মিড ক্লোজ আপে। যেন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তাদের হাবভাব, চোখের চাউনি, কথাবার্তা। বের করতে চাইছে মনের মধ্যে ঘটে যাওয়া মনস্তত্ত্বকে। ক্রমশ ফুটে উঠেছে ছ'টি চরিত্রের স্বতন্ত্র ভাব।

স্মৃতিশক্তিনির্ভর এই খেলায় লড়াই চলে যেমন নিজের সঙ্গে, তেমনই সমান তালে চলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কে কোন নাম বলবে এই নির্বাচনে এসে পড়ে কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। এক-একটি বিখ্যাত বা কুখ্যাত চরিত্রের নামের উচ্চারণ

মেলে ধরে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট। জ্ঞানের বড়াইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ঔৎসুক্যের ব্যাপ্তিকে প্রকাশ করার অহংকারও থাকে প্রচ্ছন্নে। তাই মেমরি গেম-এ বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কী কী নাম দেওয়া যেতে পারে তার একটা প্রাথমিক তালিকা সত্যজিৎ রায় খেরোর খাতায় লিখে রেখেছিলেন। সে তালিকাটি হল: ঝাঁসির রানি, ক্লিওপেট্রা, মাও-সে তুঙ, হিটলার, কেনেডি, এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, মির্জা গালিব, কার্ল মার্কস, চৈতন্যদেব, অতুল্য ঘোষ, দারা সিং, হেলেন, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথ। তালিকায় কার্ল মার্কস, মাও সে তুঙ বা চৈতন্যদেবের পাশাপাশি দারা সিং-এর নামও পাওয়া যায়। মুখে বলা নামের রকমফেরের মধ্য দিয়ে ছবির চরিত্রগুলির মানসিকতার তারতম্য চিহ্নিত করা যায়। তাই পরিচালকের দ্বারা সংযোজিত ও বর্জিত নামগুলোও খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তালিকার নামগুলোর থেকে পরে ছবিতে ঝাঁসির রানি, এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, চৈতন্যদেব, দারা সিং, সুভাষ বোস— বাদ পড়ে গেছে। মির্জা গালিব নামটা চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়ায় ছিল, পরে বাদ পড়ে। চিত্রনাট্যের খসড়ায় হিটলারের নামও ভাবা হয়েছিল। খেলা শুরু হওয়ার আগে অপর্ণা যখন নিয়ম-কানুন বোঝাচ্ছে, তখন শেখর প্রশ্ন তোলে বিখ্যাত লোকের সঙ্গে কুখ্যাত লোকের নামও বলা যাবে কি না? ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হওয়ার জন্য শুভকর্ম বা অপকর্ম, কুখ্যাত বা বিখ্যাতর কোনও বাছবিচার নেই। কুখ্যাত লোকের নামও গ্রাহ্য হবে শুনে শেখর উপমা হিসেবে বলে: গান্ধী, গান্ধী-হিটলার, গান্ধী-হিটলার-নেহেরু। খেরোর খাতায় এখানে সত্যজিৎ 'রবীন্দ্রনাথ' কেটে 'হিটলার' লেখেন। ছবিতে অবশ্য গান্ধী-নেহরু-আজাদ এই তিনটি নাম শুনি। 'রবীন্দ্রনাথ' নামটি বলে জয়া।

খেরোর খাতায় দেখা যায় জয়া, সঞ্জয়, শেখর ও হরির বলা নামগুলো প্রথম থেকেই স্থির হয়ে ছিল। কোনও কাটাকুটি নেই। খেলার আসরে এই ক'টি চরিত্রের সঙ্গে অন্য কারও কোনও বিশেষ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নেই। সংশোধন হয়েছে অপর্ণার বলা নামে তিনবার ও অসীমের ক্ষেত্রে ন'বার। বোঝাই যায় পরিচালকের এই নাম-বাছাইয়ের জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা, অনেক হিসাব কাজ করেছে। এদের বলা নামগুলো কী ভাবে পালটাতে পালটাতে গেছে নীচে তার তালিকা দেওয়া হল:

	জয়া	সঞ্জয়	অপর্ণা	শেখর	হরি	অসীম
১	রবীন্দ্রনাথ	কার্ল মার্কস	ক্লিওপেট্রা	অতুল্য ঘোষ	হেলেন	মির্জা গালিব ওমর খৈয়াম শেক্সপিয়র
২	Out	মাও সে তুঙ	ফ্রয়েড ডন ব্রাডম্যান	Out	Out	পিকাসো টেকচাঁদ ঠাকুর মাইকেল মধুসূদন রানি রাসমণি
৩	Out	Out	পিকাসো কেনেডি	Out	Out	মুমতাজ মহল মেকিয়াভেলি বালা সরস্বতী টেকচাঁদ ঠাকুর
৪	Out	Out	সরোজিনী নাইডু কেনেডি (তখন তৃতীয় রাউন্ডে বলা নাম ছিল পিকাসো) নেপোলিয়ন	Out	Out	কেনেডি (যখন অপর্ণা তৃতীয় বা চতুর্থ রাউন্ডে এই নামটি বলে না) মুমতাজ মহল

এই কাটাকুটির বহর দেখে মনে হতে পারে যেন খেলাটা চলছিল প্রধানত অপর্ণা ও অসীমের মধ্যে। অপর্ণার বলা নামগুলোর মধ্যে— ক্লিওপেট্রা-ডন ব্র্যাডম্যান-কেনেডি-নেপোলিয়ন কোনওটাই ভারতীয় নয় এবং তিনজনই পুরুষ। অপর্ণার ঘরে যে বইগুলো দেখি, তার সব ক'টিই ইংরেজি। (যদিও তাকে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' পড়তে দেখা যায়)। ঘরে রাখা বইয়ের বিষয়েও এমন কোনও সামঞ্জস্য-সূত্র নেই যার থেকে তার পছন্দের ধরনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানান বিষয়ে ঔৎসুক্যই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অসীমের চারটি নামের মধ্যে— শেক্সপিয়র-রানি রাসমণি-টেকচাঁদ ঠাকুর-মুমতাজ মহল— দুজন মহিলা, আর তিনজন ভারতীয়ের মধ্যে দু'জন বাঙালি।

খেলায় প্রথম নামটি বলে জয়া— 'রবীন্দ্রনাথ'। যে কোনও শিক্ষিত বাঙালির মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নামটি আসে। যেমন ফুলের নাম বলতে 'গোলাপ'। তালিকায় সম্ভাব্য অন্য নাম হিসেবে 'সুভাষ বোস'-এর নাম লেখা ছিল। বাঙালির

সেরা দুই আইকন। এ ছাড়া, ছবিতে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাস পড়ছিল অপর্ণা। তাই সহজভাবেই তার সচেতন মনে এই নামটি উঠে আসে। ভনিতাহীন সোজা-সাপটা মানুষ সে। ক্যামেরার ফ্রেমে ক্লোজ-শটে ধরা পড়ে শুধু জয়ার মুখ। নাম বলার সময় দেখা যায় অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত উৎফুল্ল ভঙ্গি।

দ্বিতীয় নামটি বলে সঞ্জয়— 'কার্ল মার্কস'। সে একজন লেবার অফিসার। ইউনিয়ন-আন্দোলন-শ্রমিকপক্ষ-মালিকপক্ষ এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি ধারনায় তার মনে আসা এই নামটি খুব স্বাভাবিক। এখানেও ক্যামেরা ক্লোজ-আপে। দেখা যায় সঞ্জয়ের মুখ, জয়ার পাশ-মুখ।

এর পর অপর্ণা। এখানেও ক্লোজ-আপে। মুখে আত্মবিশ্বাসী ভাব। সাবলীল ভঙ্গিতে সব ক'টি নাম বলে নিজেরটা জুড়ে দেয়— 'ক্লিওপেট্রা।' প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ক্লিওপেট্রা এক বিখ্যাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নারী-চরিত্র। মিশরের রানি, জুলিয়াস সিজারের প্রেমিকা। মার্ক অ্যান্টনির স্ত্রী। অসামান্যা সুন্দরী। শৌর্য বীর্যের প্রতীক। এবং এক আত্মবিশ্বাসী কর্মদক্ষ মহিলা।

এবার শেখর। ক্যামেরা এখানে মিড ক্লোজ-আপে। ফ্রেমে ধরা পড়ে সঞ্জয় ও অপর্ণাকে নিয়ে ফোর-গ্রাউন্ডে শেখর। খেলাটা শুনে 'যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়' জেনে সে বলেছিল 'লড়ে যাওয়া যাক।' এই লড়াকু ভাব নিয়ে সাবধানী সুরে সব ক'টি নাম বলে নিজেরটা বলে— 'অতুল্য ঘোষ'। আগের নামগুলোর সঙ্গে পারম্পর্যহীন এই নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। সে আছে আপন খেয়ালে, অপর্ণার খুলে-রাখা সানগ্লাসটা সে ইতিমধ্যে চোখে পরে ছিল। রঙিন কাচে সে এদিক ওদিক দেখে নেয়। কালো চশমার আড়ালে চোখ ঢেকে তার মনে পড়ে অতুল্য ঘোষের নাম। কালো চশমা ও অতুল্য ঘোষ। সে যুগের বাঙালির কাছে এক অভ্যস্ত সমীকরণ। নামটা বলে সে চোখ থেকে চশমা খুলে রাখে।

পরের পালা হরির। ক্যামেরা মিড ক্লোজ-এ। সে ও শেখর। আগের নামগুলো বলার সময় আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে চরিত্রগুলোকে, যেন তাদের বলা নামের সঙ্গে associate করে। বলা নামের সঙ্গে চরিত্রগুলি একাকার হয়ে যায়। এক এক করে সব ক'টি নাম ঠিকঠাকভাবে বলেই তার মুখেচোখে খেলায় জেতার তৃপ্তি। নিজেরটা বলতে ভুলে যায়। শেখর খোঁচায় 'তোরটা বল'। থতমত খেয়ে বলে 'হেলেন'। এই নামটি সংশয়ের সৃষ্টি করে। কোন হেলেন? দু'জন হেলেন আছে— হেলেন অব ট্রয় অর অব বম্বে। দুটি ভিন্ন মাত্রা ও মানের মহিলা। কোনটিকে সে ভেবেছে? প্রেমিকা দ্বারা সদ্যপ্রত্যাখ্যাত হরি কি বম্বের হেলেন অভিনীত ভ্যাম্প চরিত্রের ইঙ্গিত করছে? না কি হেলেন অব ট্রয়। ক্লিওপেট্রার মতো হেলেন অব ট্রয়ও ইতিহাস

প্রসিদ্ধ। গ্রিক পুরাণের এই নামকরা চরিত্রটি ছিল অসামান্যা সুন্দরী ও ট্রয় যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ। এই সুন্দরীটিকে নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। এক দিকে আছে যেমন বিশ্বাসভঙ্গের কথা, অন্য দিকে ইউরিপিডিসের নাটকে আছে মায়ামূর্তি ধারণের কথাও। হরি কোন হেলেনের কথা বলেছে? সে শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়েনি। 'না পড়িনি।' সে কি হেলেন অব ট্রয়ের কথা জানে? সকলকে সংশয়মুক্ত করে অপর্ণা বলে ওঠে 'ঠিক আছে ঠিক আছে— হেলেন অব ট্রয়— very good'। হরির সঙ্গে অপর্ণার যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়। খেলা শুরু হওয়ার আগে হরি আসর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। একা, দেখছিল শুকনো নদীর চর দিয়ে চলেছে সারিবদ্ধ আদিবাসী নারী-পুরুষ। দৃশ্যটি তার চেনা নাগরিক জীবনের সঙ্গে বৈপরীত্য রচনা করে। অপর্ণাই তাকে ডেকে নিয়ে আসে। ক্রিকেটের খবর পাচ্ছে না বলে সে মনমরা হয়ে আছে। শুনে জয়া ও অপর্ণা তাদের বাংলোতে ট্রানজিস্টর নিয়ে আসে। ব্যাডমিন্টন কোর্টে সেই সবচেয়ে বেশি energetically খেলছিল— তাও অপর্ণার নজর এড়ায়নি। বন্ধুদের থেকে ভিন্ন ধরনের সহজ স্বভাবটা যে হরিকে একটু আলাদা করে রেখেছে, সেটা অপর্ণার চোখে অনায়াসেই পড়ে।

এর পর অসীম। ক্যামেরা এবার সব ক'টি চরিত্রকে একসঙ্গে ধরে ক্রমশ এগিয়ে আসে অসীমের দিকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরা পড়ে অসীমের হাবভাব। এ খেলার নিয়ম-কানুন অসীম ও অপর্ণা— শুধু এই দুজনেরই জানা। অসীম নিজেই অপর্ণাকে প্রস্তাব দেয় 'আপনি শেখালে এরা আরো মন দিয়ে শিখবে।' অপর্ণা যখন খেলার নিয়মকানুন জানাচ্ছে তখন সবাই মন দিয়ে শুনছিল। সেখানে অসীমের হাবভাবটাও লক্ষণীয়। সে তখন নিজের মনে নিবিষ্ট। ব্যবহারে তার male chauvinism-এর লক্ষণ স্পষ্ট। বন্ধুদের মধ্যে সেই একমাত্র সিগারেট খায়। এবার সব ক'টি নাম বলার পর, মুখের সিগারেটের শেষ টুকরোটা দু'আঙুলে ছুড়ে ফেলে সে বলে— 'শেক্সপিয়র'। নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার ক্লোজ-আপ। সে চোখ তুলে তাকায়। 'ক্লিওপেট্রা— অপর্ণার বলা নাম। তার পরই 'শেক্সপিয়র'। আমাদের মনে পড়ে অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রার রচয়িতার কথা। এটা কি অপর্ণার প্রতি কোনও ইঙ্গিত? মির্জা গালিব ও ওমর খৈয়াম নাম দুটি কেটে সত্যজিৎ লেখেন শেক্সপিয়রের নাম। মির্জা গালিব কেটে ওমর খৈয়াম-এর নাম লেখার সময় তিনি কি ভেবেছিলেন এই কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থটির কথা? ভালবাসা-কল্পনা-মদিরা। 'আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনি real কি না?'

সদাশিব ত্রিপাঠীর বাংলো বাড়ির কম্পাউন্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি ছোট্ট বাড়ি দেখা যায়। সে বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অসীম। সেখান থেকে হরিণের

পাল দেখা যায় শুনে আবেগের সঙ্গে সে বলেছিল, 'তাহলে এখন এটাকে Juliet-এর ব্যালকনি বলা যাবে না কেন? ধরুন কেউ যদি ওখানে দাঁড়িয়ে বলত It is the east and Juliet is the sun— তাহলে কেমন হতো?' এর উত্তরে অপর্ণা বলে 'রাত্রে শেয়ালটেয়ালের অভাব নেই কিন্তু এদিকটায়।' সে কৌতুকের স্বরে অসীমের আবেগের আতিশয্যে জল ঢেলে দেয়ে। তাই অসীমকে অসহায়ভাবে বলতে হয় 'এরকম ভাবে discourage করলে তো মহা মুশকিল।' এখানে, এই খেলায় সে আবার ফিরিয়ে আনে শেক্সপিয়রের প্রসঙ্গ।

প্রথম রাউন্ড ঘুরে আসার পরই জয়া তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, যদিও নিজের হারা-জেতার চাইতেও সকলে মিলে খেলায় তার সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। সে তো জানেই 'খেলাটা যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়।' সে অতুল্য ঘোষের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের নামকে গুলিয়ে ফেলে, খেলা থেকে 'আউট' হয়ে যায়। প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষ, তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই যুগল নাম দুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। 'রবীন্দ্রনাথ' নামটি বলার মতো জয়ার পক্ষে এই ভুলটাও খুব স্বাভাবিক ও তার চরিত্রোপযোগী। ভুল করার পর তার অনুশোচনার তীব্র স্বর সঞ্জয়ের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। সঞ্জয় জয়াকে বলে 'দাঁড়ান মশাই, চেঁচিয়ে গুলিয়ে দেবেন না।...' দু'জনের মধ্যে আলাদা করে সম্পর্ক গড়ে ওঠার এই শুরু। প্রচ্ছন্নে।

সঞ্জয় নামগুলো বলতে শুরু করে। ক্যামেরা গতিশীল হয়ে ওঠে। প্রতিটি নাম বলার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একে একে সব ক'টি মুখের কাছে আসে। ক্লোজ-আপে। প্রত্যেকের মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া। একমাত্র অপর্ণাই নির্বিকার। ক্যামেরা সঞ্জয়ের মুখের উপর থামলেই, সে বলে— 'মাও সে তুঙ।' দ্বিতীয় নামটিও প্রথমটির অনুসারী। তদানীন্তন রাজনীতির ক্ষেত্রে নকশাল আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের জুটমিলের অবস্থা ক্রমশ অধোগতির দিকে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রমিকপক্ষের জঙ্গি আন্দোলন, ঘেরাও ও ধর্মঘটে শিল্প-বাণিজ্যের দিশেহারা অবস্থা। জুট মিলের লেবার অফিসার সঞ্জয়ের 'মাও সে তুঙ' নামটি স্বচ্ছন্দেই মুখে আসে।

অপর্ণার পরের নাম— 'ডন ব্র্যাডম্যান'। এ নামটিও সত্যজিতের প্রথম তালিকায় ছিল না। চিত্রনাট্যে বা ছবিতে ঘটনার গতিপথ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে নামটি তাঁর সচেতন ব্যবহার বলে মনে হয়। এ নামটি বলে অপর্ণা হরির দিকে তাকায়, ঠোঁটে তার হাসির মৃদু ছোঁয়া। হরির মুখ ক্যামেরায়। সে একজন চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়, তাই স্বভাবতই সে খুশি হয়। সত্যজিৎ রায় এখানে অপর্ণার জন্য

'ফ্রয়েড' নামটির কথাও ভেবেছিলেন। অপর্ণা জানে যে তার সম্পর্কে অসীমের একটা মানসিক লড়াই চলছে। অসীমের তার প্রতি কৌতূহল, অন্য দিকে নিজের আত্মাভিমানকে গর্বিত সুরে রাখা, এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকটার প্রতি 'ফ্রয়েড' নামটির মারফত একটা ইঙ্গিত দেওয়া হত। যাই হোক, অপর্ণা— সত্যজিতের ভাবনায়, এ সব দিকে না গিয়ে চলে আসে 'ডন ব্র্যাডম্যান'-এর মতো একটা সহজ জনপ্রিয় নামে। অসীমের প্রতি দৃষ্টি সরিয়ে সে চলে আসে হরির পছন্দের আওতায়।

শেখর একটু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে 'শেক্সপিয়র' নামটা বাদ দিয়ে চলে আসে 'মাও সে তুঙ'-এ। সঞ্জয় ও জয়া সমস্বরে out out বলে চেঁচিয়ে ওঠে। হতভম্ব হরি এ সব দেখেশুনে হাল ছেড়ে দেয়। সে খেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করে, উঠে দাঁড়ায়। অসীম তাকে ধমক দিয়ে বসায়। সঞ্জয় ও শেখর হাত নেড়ে তাকে বসতে বলে। নামগুলো মনে রাখার জন্য mnemonic device হিসেবে প্রত্যেকের বসার প্যাটার্নটা অসীমের কাছে হয়তো জরুরি। অপর্ণা এখানে কিন্তু নির্বিকার। নামগুলো মনে রাখার জন্য তার বাড়তি কোনও অনুষঙ্গের প্রয়োজন নেই।

এর পর ক্যামেরা অপর্ণাকে ধরে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে অসীমের মুখের ওপর। অসীম স্পষ্টতই আত্মসচেতন। সে সিগারেট ধরিয়ে বলে 'রানি রাসমণি।' এই নামটি সত্যজিতের প্রাথমিক তালিকায় পয়লা নম্বরে ছিল। অনুমান করা যায়, এটিও তাঁর পরিকল্পিত ভাবনার অর্ন্তগত। 'শেক্সপিয়র'-এর পর এই নামটি কি অপ্রত্যাশিত? সত্যজিৎ এখানে আরও তিনটি নাম— পিকাসো, মাইকেল মধুসূদন, টেকচাঁদ ঠাকুর-এর কথাও ভেবেছিলেন। শেক্সপিয়রের পর পিকাসো, মাইকেল মধুসূদন বা টেকচাঁদ ঠাকুর নামে একটা ধারাবাহিকতা থাকত। সত্যজিৎ এই নামগুলোর কথা ভেবেও নির্বাচন করেন 'রানি রাসমণি' নামটি। অসীমের চরিত্রায়নে এই নির্বাচন ইঙ্গিতময়। অসীমের হয়তো অপর্ণার কাছে, এই নামটির মাধ্যমে একটু unpredictable হওয়ার ইচ্ছে। বড্ড বেশি ধরা দিয়ে ফেলেছে সে। অপর্ণার আগের নাম 'ডন ব্র্যাডম্যান' বলার সময় হরির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় তার নজর এড়ায়নি। শেক্সপিয়র নামটিতে যে প্রাসঙ্গিকতা ছিল, 'রানি রাসমণি' নামটিতে কি সে প্রাসঙ্গিকতা ছিন্ন হয়? নিম্নবর্গের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও উনবিংশ শতাব্দীর এই বিখ্যাত রমণী তেজস্বিতায় ও নিপুণ বৈষয়িক বিষয়বোধে ইংরেজদের টেক্কা দিতে পেরেছিল। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। ব্যক্তিগত জীবনে, মধ্যবয়সে এসে স্বামীকে হারিয়েও প্রথাগত লেখাপড়া না-জানা মহিলা কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সে যুগের একজন আদর্শস্থানীয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়

হয়ে আছেন। অপর্ণার বলা 'ক্লিওপেট্রা' বা তার তারিফ-করা 'হেলেন অব ট্রয়'-এর পাশাপাশি অসীম যেন সচেতনভাবেই 'রবীন্দ্রনাথ'-এর পর নিয়ে আসে আর এক স্মরণীয় বাঙালির নাম।

এর পর ক্যামেরা ফোরগ্রাউন্ডে সঞ্জয়কে ধরে, অপর্ণা ও শেখরকে (পেছন থেকে) দেখায়। অপর্ণা আপন মনে নখ খুঁটে চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে নিস্পৃহ ও উদাসীন ভাবের পেছনে সে যাচাই করে নিচ্ছে পরিস্থিতিকে। ক্যামেরা সরে গিয়ে একে একে হরি, অসীম ও জয়াকে ফ্রেমে ধরে চলে আসে সঞ্জয়ের কাছে। সঞ্জয় সব ক'টি নাম বলে, অপর্ণার বলা শেষ নামটা ভুলে যায়। তার ইতস্তত ভাব দেখে শেখর জিজ্ঞেস করে, সময়ের বালাই আছে কি না? অসীম বলে, দশ সেকেন্ড। প্রথমবারের জন্য ক্যামেরা নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের বাইরে গিয়ে অন্যজনের হাবভাব দেখানোর জন্য সরে আসে। সঞ্জয়ের আটকে-যাওয়া অবস্থায় ক্লোজ-আপে দেখি অপর্ণা ও অসীমের মুখ। দু'জনেরই নামটা মনে আছে। তারা নির্বিকার। সঞ্জয় সময়-সীমার আওতায় এসে পড়ায় জয়া উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ক্যামেরা ঘুরে আসে তার কাছে। সে হাতে ভর দিয়ে শরীরটা মাটিতে এলিয়ে দিয়েছে। সঞ্জয় হয়তো পারবে না— এ জন্য সে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইঙ্গিতে তার হতাশাও জানায়— অপর্ণাকে। সময়-সীমা শেষ। জয়া আক্ষেপ ও সমবেদনায় হাত দিয়ে সঞ্জয়কে স্পর্শ করে বলে ওঠে, 'পারলেন না— ডন ব্র্যাডম্যান।' খেলা শুরু হওয়ার সময় সঞ্জয় বলেছিল, যে-সব ক'টি নাম ঠিকঠাক বলতে পারবে সে টিকে থাকবে। সঞ্জয়ের মানসিকতায় এই টিকে থাকাটা খুব জরুরি। হাজার কারণ সত্ত্বেও মা বাবা ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ববোধের থেকেই আপস করেও তার চাকরিটাকে টিকিয়ে রাখতে হয়। এই খেলায় কিন্তু সে আর টিকে থাকতে পারে না, ছিটকে যায়।

এর পর অপর্ণা ক্লোজ-আপে। সঞ্জয়ের স্মৃতি উদ্ধারের চেষ্টাকৃত প্রয়াসের পর অপর্ণা সাবলীলভাবে নামগুলো বলে যায়— সে বলে 'কেনেডি'। অসীম আরও নির্দ্দিষ্ট হতে চায়। হয়তো মনে রাখার সুবিধার জন্য এই mnemonic device। সে বলে which Kennedy? অপর্ণা বলে Bobby! ববি কেনেডি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আত্মবিশ্বাসী ও বেপরোয়া পুরুষ। তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে আলোচিত মানুষ। নিজের দেশে সিভিল রাইট্স আইন প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুব সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ। বড় ভাই জনের মৃত্যুর পর এক গভীর বিষাদগ্রস্ততা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই খেলার আসরে অপর্ণা এই নামটির সঙ্গে সঙ্গে একটা সাম্প্রতিকতার ছোঁয়া এনে দেয়। সত্যজিৎ রায় এ-প্রসঙ্গে 'পিকাসো' নামটির কথাও ভেবেছিলেন।

ভেবেছিলেন অসীমের জন্যও। অপর্ণার এই নামটির পর উচ্চারিত-নামের তালিকা বিস্তৃত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়েছে এলোমেলোও। আগের একটা দৃশ্যে অসীম অপর্ণাকে বলেছিল 'আপনাকে খুব বোঝা গেল না।' জবাবে অপর্ণা বলে 'সেটার কি খুব দরকার ছিল।' দরকারটা অসীমের দিক থেকে। সে অপর্ণার চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তার আবরণ খুলে দিয়ে চায়। পারে না। বাধা পেয়ে ফিরে আসে।

এ বার ক্যামেরার ফ্রেমে শুধু অসীম। তার বলার ফাঁকে ক্যামেরা ঘুরে আসে জয়ার কাছে। সঞ্জয় তাকে জিজ্ঞেস করে 'বালিশ'। জয়া অসীমের দিকে ইঙ্গিত করে বলে 'ওর বলা হয়ে যাক, তার পর।' অসীমের বলা নাম 'টেকচাঁদ ঠাকুর।' ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রসিদ্ধ মানুষটি এখন বিস্মৃত-প্রায় নাম। সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছাড়া ক'জনই বা তাঁর 'আলালের ঘরে দুলাল' পড়েছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক অসীম ও সঞ্জয় ছাড়া এ আসরের আর কারও কাছে আশা করা যায় না এই নামটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার। অপর্ণা খেলার নিয়ম নির্দিষ্ট করে বলার সময় বলেছিল 'বিখ্যাত লোকের নামটা সকলের জানা হতে হবে।' এখন প্রতিযোগী মাত্র দু'জন। অসীম ও অপর্ণা। বিখ্যাতর অজুহাতে অপ্রচলিত এই নামটি অসীম তার তালিকায় ঢুকিয়ে দেয় কিছুটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে? কেননা, পরের ধাপে সে নিজের বলা এই নামটিতেই এসে হোঁচট খায়। সত্যজিতের খেরোর খাতায় দেখি এ বারের নামের জন্য তাঁর তালিকাটি বেশ ছড়ানো-ছেটানো। মুমতাজ মহল-মেকিয়াভেলি-বালা সরস্বতী এ ধরনের কয়েকটি সামঞ্জস্য-সূত্রহীন স্ববিরোধী ভাবনার নাম কি অসীমের চরিত্রের জটিলতা বা ব্যতিক্রমী হওয়ার ইচ্ছের দিকে ইঙ্গিত করে? বিশেষ করে মেকিয়াভেলি নামটি— যে নামের সঙ্গে কৌশলী, শঠ, অবিশ্বস্ত এই বিশেষণগুলো যুক্ত হয়ে আছে। যে কার্যসিদ্ধির জন্য অনৈতিক কাজ করতেও পেছ-পা নয়। কোনও একটা জায়গায় নিরাপত্তাহীনতার অভাবে অসীম যেন কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না। খেলাটা আর তার কাছে খেলা নেই। সে চায় জিততে বা অপর্ণাকে পরাস্ত করতে।

অসীমের বলা শেষ হলে, অপর্ণার অনুমতি নিয়ে সঞ্জয় ফরেস্ট বাংলোতে চলে যায়, বালিশ আনতে। তার গলায় শুনি গুনগুন করে গাওয়া গানের কলি 'ঘরেতে ভ্রমর এলো'। তখনই আমাদের মনে এসে পড়ে ভ্রমরের প্রসঙ্গ। ছবির প্রথম দিকে বাংলোয় কাঁচা ঘুম থেকে উঠে হরি যখন ঘরের বাইরে আসে, তখন অসীমের 'কী রে, ঘুম হল?' প্রশ্নের উত্তরে বলে '...এক ব্যাটা ভোমরা মাইরি কনস্টান্ট কানের সামনে বোঁ বোঁ বোঁ করে চলেছে।' অসীম তার পুরোনো প্রেমের জের টেনে ঠাট্টার সুরে বলে 'তোর ঘরে কি আবার ভ্রমর-টমর আসতে আরম্ভ করল নাকি?' সঞ্জয় আগে থেকেই

শিস দিতে শুরু করেছে 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।' এখানে তার গলায় সেই একই গানের টানে বোঝা যায় তারও মনে এবাব হয়তো ভ্রমরের নেশার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। একটি বালিশ নিয়ে, পরক্ষণেই কী মনে করে আরও একটা বালিশ নেয়। আয়নায় চুল ঠিক করে ফিরে আসে। জয়াকে বালিশ দেয়। অপর্ণা তখন তার বলা নামটা শেষ করছে— 'নেপোলিয়ন'। এই মানসিক লড়াইয়ে এসে এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধবিজয়ী সম্রাটের নাম। যার নাম জড়িয়ে আছে ফরাসী বিপ্লবের প্রধান যোদ্ধা হিসেবে। যিনি বিজয়ী হয়েও পরিণামে ওয়াটারলু যুদ্ধে বিজিত। এটাও কি অসীমের প্রতি কোনও ইঙ্গিত? অপর্ণা সঞ্জয়কে তারিফ জানিয়ে বালিশটা নেয়।

এর পর অসীম। ক্যামেরা ক্লোজ-আপে। ওর প্রথম পাঁচটি নাম বলার পরই ক্যামেরা চলে আসে জয়ার কাছে। বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে সে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে সাঁওতালি গয়নার কথা। সকলের মধ্যে থেকেও দুজনের মধ্যে কথোপকথনে একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি হয়। আদিবাসী রমণী। তাদের সাজগোছ। খোলামেলা আড়ষ্টতাহীন জীবনযাত্রা: বিদেশে স্বামীর আত্মহত্যা। নিজের কাছে নারীত্বের অবমাননা ও অভিমান। তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ সে জানে না। 'হয়তো কেউ একজন ছিলো।' তার অভিমান প্রকাশ করার মতো একমাত্র মানুষটিও আর নেই। কোনও বোঝাপড়া সম্ভব নয়। এখন বোঝাপড়া শুধু নিজের সঙ্গে। একটাই তো জীবন। অথচ সে একা। নিঃসহায়। বাইরের অন্য সকল আশ্রয়ের মধ্যে থেকেও তার নারীসত্তার ঘনিষ্ঠ অবলম্বন কোথায়? ঠিক এই সময়ে অসীম বলে 'মুমতাজ মহল।' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নামটি আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ও দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে।

এর পর অপর্ণার পালা। এবার যে যেন প্রথম থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে। অসীমকে সে আরও চিনতে পেরেছে। সে এখানে এসে থমকে যায়। একটি নামও উচ্চারণ করে না। ক্যামেরায় তার সংযত ও দৃঢ় মুখচ্ছবি। খেলা শুরু হওয়ার আগে সে-ই বলেছিল 'খেলাটা কিন্তু আসলে খুব সোজা।' এখন সে বুঝে গেছে খেলাটা আর খেলা নেই। হয়ে পড়েছে আত্মসম্মানের লড়াই। তার চুপ করে থাকা দেখে অসীম বিস্মিত। জয়ার কাছে এ যেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। 'তোর আগের নামগুলো মনে নেই?' শেখর বুঝে উঠতে পারে না। অসীম স্থিরদৃষ্টিতে অপর্ণার দিকে চেয়ে থাকে। সঞ্জয় আড়চোখে দেখে অপর্ণাকে, তার পর অসীমকে। সে হয়তো বা আন্দাজ করতে পারে এদের মানসিক টানাপোড়েনের রহস্য। শেখর পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য বলে একটু ঠান্ডা জল খাবেন? কুয়োর জল? অপর্ণা মুখ তোলে। বলে 'আমার হরিবাবুর দশা হয়েছে... অসীমবাবুরই জিত।' সে প্রমাণ করে দেয় তার

মনের জোরের। নিশ্চিত জয়ের কাছাকাছি এসেও সে হার স্বীকার করে নেয়। আমাদের মনে পড়ে যায় 'দুই বোন' উপন্যাসের উর্মিলার কথা। পরাস্ত মানুষটাকে জিতিয়েও নিজে জেতা যায়। অসীম সেটা বোঝে। তার কাছে অপর্ণার রহস্যময়তা আরও বাড়ে।

ইতিমধ্যে নেপথ্যে বাজনা শুরু হয়ে গেছে। ক্লোজ আপের আঁটসাঁট ভাবটার থেকে যেন মুক্তি পেয়ে পায় দৃশ্যগুলি। time আর space-এর বাঁধন থেকে চলে আসে চলমান ও পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলির মধ্যে। চরিত্রগুলিও এতক্ষণ যেন কোথাও মুখোশ পড়ে ছিল এবং তারা বাধাহীন হয়ে (ক্যামেরার সচলতার সাহায্যে) মনের কথাগুলিকে প্রকাশের জন্য ব্যস্ত। আমরা চকিতে চলে আসি নাগরদোলায় চক্রাকারে ঘোরার দৃশ্যে। এই দৃশ্যের পর বন্ধুদের আর এক সঙ্গে দেখা যায়নি। যে যার আপন বৃত্তে আটকা পড়ে যায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এদিক-সেদিক। অসীম-অপর্ণা, সঞ্জয়-জয়া, হরি-দুলি, শেখর আর তার জুয়া। ঘটনার গতিপথ এদের এক-এক দিকে টেনে নিয়ে যায়।

'মেমরি গেম'-এর পর, মেলার দৃশ্য থেকে ছবির আঙ্গিক সম্পূর্ণ পালটে যায়। মানসিক উদ্বেগ ও অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে দৃশ্যপট। যে ছন্দ-তাল-লয়ে দৃশ্যকে এ-যাবৎ সাজানো হয়েছিল তার থেকে ভিন্ন রকম হয়ে যায় পরবর্তী দৃশ্যের ছন্দ-তাল-লয়। ছড়িয়ে পড়া ঘটনাগুলোকে এক সূত্রে গাঁথা হয়, পাশ্চাত্য সংগীতের প্রকরণ-পদ্ধতিতে সাঁওতালি নাচের দৃশ্যকে বারবার ফিরিয়ে এনে। (যূথবদ্ধ নাচের খণ্ডিত দৃশ্যাংশ অন্য ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে ছবিতে সাতবার ফিরে ফিরে আসে।)

আলোচ্য ছবিতে এই চার বন্ধুর মেলার দৃশ্যের পরবর্তী ঘটনাগুলিকে সত্যজিৎ সাজিয়েছেন শুকনো নদী-প্রান্তরে রুক্ষ বালুময় নির্লিপ্ত প্রেক্ষাপটে, সদাশিবের বাংলোয় একটি ঘরের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে মৃদু আলোর ব্যঞ্জনায়, অরণ্যের খোলা প্রকৃতির মধ্যে শরীরী মিলনে, ভারহীন চপল পরিমণ্ডলে জুয়ার তাৎক্ষণিক লেনদেনের হিসেবনিকেশে, ফরেস্ট বাংলোর সামনে সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোছায়ায়।

মেলায় চক্রাকারে ঘোরা নাগরগোলার দৃশ্যটি এসে থামে কাচের চুড়ির পশরার দৃশ্যে। অসংখ্য বর্তুল আকারের চুড়ির ওপাশে দেখা যায় অসীম-অপর্ণা, সঞ্জয় ও জয়াকে। আঙ্গিকগত সৌষ্ঠবের সঙ্গে এই চিত্রকল্পে, অসীমের একটি সংলাপে 'কলকাতা অবধি টিকলে হয়' পরস্পরের মধ্যে গড়ে-ওঠা সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি। অপর্ণার খেলায় স্বেচ্ছায় হেরে যাওয়ার রহস্য অসীমের কাছে তার চরিত্রের মতোই দুর্বোধ্য। সেটাকে জানার জন্যই মেলার ভিড়ের বাইরে

যেতে চায়। শুকনো নদীচরে এসে তার মীমাংসা চায়। বাইরে আত্মপ্রত্যয়, দম্ভ, আধিপত্য দেখানোর ভাবভঙ্গির পেছনে অসীমের কোথাও যেন একটা অস্তিত্বের সংকট লুকিয়ে আছে, যে সংকটকে সে মোকাবিলা না করতে পেরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপে লুকিয়ে পড়ে। এই দুই মানসিকতার সংঘাতে সে মাঝেমধ্যে ব্যবহারিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাকে ভণিতার আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়। এই ভণিতা অপর্ণার কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। অপর্ণা ভাবে 'এই ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাসটা একটু থেঁতলে দিলে হয়।' অসীমের বন্ধুদের কাছে আধিপত্যের বৈপরীত্যে অপর্ণার কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটা খুব স্পষ্ট হয়ে যায়।

নদীতীরের নিস্তব্ধ পরিবেশে অপর্ণা নিজেই ধরা দেয়। ছবিতে আগের একটি দৃশ্যে অসীমের 'আপনাকে ঠিক বোঝা গেল না' কথার জবাবে অপর্ণা বলেছিল 'তার কি খুব দরকার আছে?' এখন সে বলে 'আপনাকে হয়তো আমি একটু সাহায্য করতে পারি।' 'মেমরি গেম' খেলার সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাশক্তিটা ক্রমশ আলগা হতে থাকে। দৃশ্যে অপর্ণার আঁজলা করা হাতে নদীর বালি আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে পড়ে। বাইরের আবরণটা খুলে ভেতরের মানুষটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। নিরুত্তাপ কণ্ঠে সে তার জীবনের গভীর ক্ষতের কথা বলে— মার আগুনে পুড়ে মৃত্যু, দাদার বিদেশে রহস্যাবৃত কারণে আত্মহত্যা, আগুন দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়া, দাদার অবর্তমানে বন্ধুহীন হয়ে পড়া। প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার অবচেতন মনের বিবর্ণ রূপরেখা। নদীচরের নিরাসক্ত শূন্য চেহারাটা যেন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক নির্ভরযোগ্য চিত্রকল্প রচনায় সাহায্য করে।

অসীম ও অপর্ণাকে ফরেস্ট বাংলোয় একবার ফিরে আসতে হয়েছে অপর্ণার ফেলে যাওয়া কালো চশমা নেওয়ার জন্য। সন্ধ্যার ম্রিয়মান আলোর লং শটে বাংলোটাকে প্রাণহীন পরিত্যক্ত বাড়ি বলে মনে হয়। সেখানে তাদের চমক ভাঙে রুগ্ণ বালকের করুণ আর্তস্বরে। চৌকিদারের অসুস্থ বউ-বাচ্চাকে একবারও দেখতে না আসার স্বীকারোক্তিতে সংবেদনশীলতার প্রশ্নে উদাসীন অসীমের অপ্রস্তুত ভাব আবার ধরা পড়ে যায় অপর্ণার কাছে। চৌকিদারের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের মূক যন্ত্রণাকাতর পরিবেশ থেকে সত্যজিৎ তখন আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে দেন বনের মধ্যে দুরন্ত হরিণের দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে। দৃষ্টিনন্দন এই দৃশ্যটিকে মুগ্ধচোখে দেখে অসীম ও অপর্ণা। দীন দরিদ্র মানুষের বাস্তব জীবনের নারকীয় পরিবেশের পাশাপাশি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। দৃশ্য দুটি যেন শহুরে মানুষের শৌখিন মনোভাব সম্পর্কে নীরব মন্তব্য রাখে। ন্যারেটিভ প্যাটার্নে সত্যজিৎ ছবির মূল ঘটনাকে চিত্রায়িত করার ফাঁকে ফাঁকে চলে যান একটি আপাত-অপ্রাসঙ্গিক অথচ সংলগ্ন

কোনও ডিটেল্‌স্‌-এ, যা অলঙ্কৃত ও সমৃদ্ধ করে তোলে তাঁর প্রধান বক্তব্যকে। যেমন ভাটিখানার দৃশ্যে দেখি, অজানা গন্তব্যে চলে যাওয়া একটি মালগাড়ির চিত্রকল্প।

অপর্ণার আত্মোন্মোচনের দৃশ্যের পর অসীমকে দেখি ধ্বস্ত অবস্থায়। সে মেলায় কাচের চুড়ির মতো তাদের সম্পর্ককে অরণ্য থেকে প্রসারিত করে কলকাতা অবধি টিকিয়ে রাখার আকুতি জানায়। অপর্ণাও হয়তো তার একাকিত্বের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বন্ধুত্বের প্রসারিত হাতটিকে ধরতে আগ্রহ দেখায়।

মেমরি গেম খেলার সময় থেকে যে সম্পর্কের মৃদু সূচনা, তারই সূত্র ধরে মেলার আসর থেকে জয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে সঞ্জয় চলে আসে বাংলোয়। সন্ধ্যার নিঝুম পরিবেশে নিস্পন্দ গাছপালার মধ্য দিয়ে দু'জনের হেঁটে আসা এক ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। জয়ার মুখে 'গা ছমছম' শব্দের উচ্চারণ পরিবেশকে করে তোলে আরও ঘন, সচেতন করে শরীর সম্পর্কেও। সাঁওতালি গয়না ফিরে আসে জয়ার সাজসজ্জায়। বৈধব্যের বাঁধ ভেঙে প্রগল্‌ভ সাজে সজ্জিত জয়া। ভেতরের ঘরের আলোকে আড়াল করে ছায়ার মতো বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায়। এ ঘরের আলো-আঁধারি পরিবেশে দেখি সে সাপের মতো দরজাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে। তীব্র অভিমানের সুরে তার স্বামীর মৃত্যুর কথা বলে। ক্লোজ-আপে ক্যামেরা যেন তার দেহের ভাষার প্রকাশকে অতীত পার করে বর্তমানের সীমানায় এনে দাঁড় করায়। জয়ার বৈধব্য, স্বামীর বিদেশে অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা তার জীবন থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। তার কথায় ব্যথার চাইতে ঔদাস্যের সুরই বেশি। 'স্বামী মরে গেলে আর শুধু স্বামী মরে না।' মরে সাধ-আহ্লাদ, যৌবন, কামনা-বাসনা অনেক কিছুই। এই মরণ থেকে সে হয়তো মুক্তি খোঁজে। বৈধব্য জীবন যে সামাজিক বাধানিষেধে গণ্ডিবদ্ধ চলার পথ তৈরি করে দিয়েছে, তার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য মন বিদ্রোহ করে। 'আপনি কি ভূত দেখছেন' কথা ক'টি আমাদের পরিচিত জয়াকে সম্পূর্ণ অচেনা করে তোলে। সংলাপের পরবর্তী কথাতে তার বঞ্চনার তীব্র হাহাকার শুনতে পাই। এই নিরালা ঘনিষ্ঠ পরিবেশে একটি সম্পর্কের আশ্রয়ের আশায় অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এসে জয়ার বঞ্চিত নারীসত্তা লাঞ্ছিত হয় এক বিপন্ন কাপুরুষের কাছে। নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিকটিক শব্দ, টেবিলে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পড়ে-থাকা কফি, ফটো অ্যালবাম, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট যেন still life-এর মতোই এই করুণ মুহূর্তের নীরব সাক্ষী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাংলো থেকে বেরিয়ে সঞ্জয়ের হেঁটে আসার ভঙ্গি, আবছা আলোয় পাজামা-পাঞ্জাবির সাদা রং যেন এক পলাতক পুরুষের ম্রিয়মান চেহারাটাই ফুটিয়ে তোলে। তার অন্যমনস্ক ভাব দেখে অপর্ণার 'এত কী ভাবছিলেন?' প্রশ্নের উত্তরে 'ইয়ে-আমরা কফি খাচ্ছিলাম' যেন সন্ত্রস্ত অজুহাতের মতো শোনায়।

মেলার ভিড় থেকে বেরিয়ে হরি— শিকারি যেমন মুখে করে নিয়ে যায় তার শিকার— তেমনই দুলিকে হাত ধরে অপস্রিয়মাণ অরণ্যের মধ্য দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে একটা নিরিবিলি জায়গায়। শারীরিক মিলন-দৃশ্যে ক্যামেরা যেন সরীসৃপের মতো নগ্ন গা ঘেঁষে এগোয়। হরি দুলির চুলে পায় আদিম প্রকৃতির গন্ধ 'তোরা চুলে কী লাগাস রে?' সে দুলিকে কব্জির জোর, ব্যাগ ভরতি টাকা, আর শহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রার লোভ দেখায়। শহুরে এক নারীর প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে সে আদিবাসী মেয়েটিকে প্রতিশ্রুতি দেয় পরচুলা কিনে দেওয়ার। 'তোর এই চুল— তার ওপর আরেকটা চুল।' উচ্চবর্গের এক নারীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে হরি অরণ্যে এসেছিল মনের ঘা শুকোতে। এখানে এসে সে এক নিম্নবর্গের মানুষের কাছে দৈহিক পীড়নে আক্রান্ত হয়ে শরীরে ক্ষত নিয়ে ফিরে যায়।

ছবির প্রথম দিকে চার বন্ধু মিলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সময় শেখরের মুখে শুনি '...আমরা কি উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে চলেছি, না আমাদের কোনো লক্ষ্য আছে? অবিশ্যি লক্ষ্য না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ লক্ষ্য থেকেও আর কটা লোক বড়লোক হয়েছে।' এ কি একজন 'টিপিক্যাল প্যারাসাইটিক চরিত্রের' জীবনভঙ্গি? না কি বন্ধুদের উদ্দেশ্যহীন জীবনের মর্মকথা বলে দেওয়া? মেলায় শেখর জুয়া খেলায় 'হোলসেল লস' করেও নির্বিকার। উদ্বেগহীন যুবকটির হারা-জেতা, লাভ-ক্ষতি নিয়ে সমস্যাশূন্য জীবন।

চারটি নাগরিক চরিত্র শহর ছেড়ে কয়েকটি দিন প্রাকৃতিক পরিবেশে অলস মন্থর ভঙ্গিতে সময় কাটাবে বলে বেরিয়ে— সেখানেও তাদের সমস্ত নাগরিক সংস্কার ও সমস্যা এনে ফেলে। অরণ্যের সান্নিধ্যে এসেও তারা প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে উপভোগ করতে পারে না। শিথিল দিনযাপনের সময়েও তাদের কোনও সমস্যার সমাধানসূত্র মেলে না। তবে মনের মানচিত্রের মাপজোকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। শৌখিন দুঃখবোধের আড়ালে ঢাকা পড়া জীবনের উপলব্ধির অভাবটাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরে বেড়ানো যুবক ক'টির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে, নেশার আশ্রয়ে প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায়, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হতে পারার ব্যর্থতায়, আর নারী-পুরুষের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে এই ছবিতে স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙনের চিহ্নটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

[illegible]

[illegible] : [illegible] - Karl Marx - Cleopatra - [illegible] - Helen - Omar Khayyam
and - Mao Tse Tung -

[illegible] ([illegible]) : [illegible] - Marx - Cleopatra - [illegible] - Helen -
Omar Khayyam, Mao Tse Tung, Freud -

[illegible] : [illegible] - [illegible] -

[illegible] : [illegible] -

[illegible] : [illegible] - Karl Marx - Cleopatra - [illegible] -
Helen - Mao Tse -

[illegible] and ! and !

[illegible] : [illegible] ;

[illegible] : [illegible] and !

[illegible] : [illegible] -
[illegible] and [[illegible]]
[illegible] : Omar Khayyam !

[illegible] : [illegible] - [illegible] - Karl Marx - Cleopatra -
[illegible] - Helen - Omar Khayyam - Mao Tse Tung -
~~Freud~~ ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] [illegible] : [illegible] - [illegible] - Karl Marx - Cleopatra,
[illegible] - Helen - Omar Khayyam - Mao Tse Tung
Mao Tse Tung - [[illegible]]
[illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible] : Freud-[illegible]

[illegible] ! — — [illegible] —

[illegible] : [illegible] —

[illegible] : [illegible] - Karl Marx - Cleopatra - [illegible] -

Helen - [illegible] - Mao Tse Tung -

Freud - [illegible] - Picasso —

[illegible] : [illegible] [[illegible] - memory [illegible] !

[illegible] : [illegible] ! [illegible] - Karl Marx - Cleopatra [illegible] -

Helen - [illegible] - Mao - ~~Freud~~ ~~[illegible]~~ -

Freud - [illegible] - Picasso - ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] : [illegible] - Marx - Cleopatra - [illegible] —

Helen [illegible] - [illegible] - Mao Tse Tung

Freud - [illegible] Picasso - ~~[illegible]~~ - [illegible]

~~[illegible]~~ Kennedy — [illegible]

[illegible] : [illegible] Kennedy ?

[illegible] : [illegible] - Marx - Cleopatra - [illegible] —

Helen - [illegible] - [illegible] - Mao -

Freud - [illegible] - Picasso - ~~[illegible]~~ [illegible]

~~[illegible]~~ Kennedy - Tenzing Norkay [illegible] - Kennedy -

~~[illegible] : [illegible] Kennedy ?~~

[illegible] : [illegible] Kennedy.

[illegible] : [illegible] - Marx - Cleopatra - [illegible] —

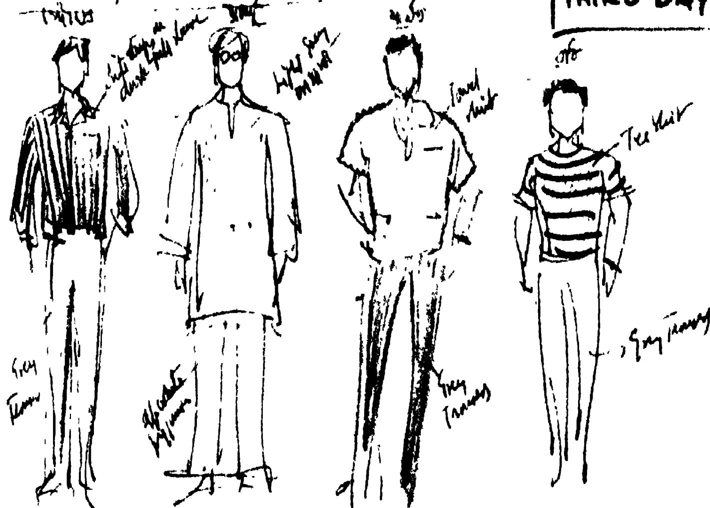
Helen [illegible] - [illegible] - Mao Tse Tung -

Freud - [illegible] -

~~[illegible]~~ [illegible] —

[illegible] : [illegible] ?

TRIPATHI'S / CONSERVATOR / MEMORY GAME / MELA — THIRD DAY



অসীম : ২টো dark hawaiian (cellular), ২টো check hawaiian, ২টো full sleeve dark striped shirt, ২টো [illegible], ২টো off white pant, ২টো grey pant, ২টো dark grey pant, ২টো underwear

সঞ্জয় : ২টো light check hawaiian, ২টো light stripe hawaiian, ২টো [illegible], ২টো dark grey pant, ২টো light grey pant, [illegible], [illegible]

হরি : ২টো T-shirt, ২টো [illegible] shirt, [২টো [illegible] light grey pant, ২টো [illegible] grey pant]

শেখর : ২টো [illegible] hawaiian, ২টো check shirt (hawaiian), ২টো T-shirt (striped), ২টো off white cotton pant, ২টো grey pant, black shirts

খেরোর খাতা। অরণ্যের দিনরাত্রি: মেমরি গেমের জন্য চারবন্ধুর পোশাকের পরিকল্পনা

নদী হয়ে ওঠে সংকেতময়: সত্যজিতের ছবিতে

গঙ্গার ওপর দিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে ট্রেন চলেছে বারাণসীর দিকে। ক্যামেরার চোখে ট্রেনের ভেতর থেকে দেখি বহমান নদী। ট্রেনের গতিতে পেছনে সরে যায় লোহার থাম, ভেসে আসে গুম-গুম শব্দ, ক্রমশ এগিয়ে আসে তীরবর্তী বারাণসী শহর—দৃশ্য ও শব্দ মিলে মনে এক অজানা ভয়, নতুনের প্রতি কৌতূহল, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই সঙ্গে আশা ও আশঙ্কার সঞ্চার করে। গ্রাম ছেড়ে আসা ছিন্নমূল হরিহর তার পরিবার নিয়ে নতুন জীবন গড়ার আশায় বারাণসী এসে পৌঁছয়। ঘাটের পারে ভোরবেলা পাখিকে খাওয়ানোর জন্যে উদাত্ত ডাক যেন মহাজীবনের প্রতি পুণ্যার্ঘ্য। পুণ্যভূমি বারাণসীর শাশ্বত রূপ। পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী গঙ্গা নীরবে বয়ে চলেছে। মহাকালের সাক্ষী। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক। প্রবাদ আছে বারাণসী সব মানুষের রক্ষাক্ষেত্র, সকল ধর্মের এক আশ্চর্য সহাবস্থানভূমি। গঙ্গাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই প্রাচীনতম শহরটি। নদীর ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের ইতিহাস যেন সমান্তরালভাবে চলে। কালের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়।

অপরাজিত ছবি করার সময় কাহিনির বিষয়ের সঙ্গে এই নদী ও নদীর পাড়জোড়া বিশাল ঘাটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সত্যজিৎ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন: 'অপরূপ এই পরিবেশের কোনো তুলনা হয় না। ইচ্ছে করে এর প্রভাব মনের মধ্যে আরো সঞ্চয় করি, তা পবিত্র করবে, সঞ্জীবিত করবে।... এই অতুলনীয় দৃশ্যই মনে প্রেরণা এনে দেবার মতো যথেষ্ট। আশ্চর্য, অতুলনীয়, বিস্ময়কর বললে ঘাটগুলির

কোনো বর্ণনাই হয় না। কেন অতুলনীয়, মনের মধ্যে কেন তার প্রভাব— তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তার ফলে অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে, স্থির করা যাবে ছবিতে এর কতটা ধরাতে, কতটা ছাঁটতে হবে।'

দৃশ্য যখন স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে এসে পড়ে, তখন আমাদের চোখ কান মন সহজেই একটা চেনাজানার গণ্ডির মধ্যে পড়ে। তখন আমরা পরিবেশের রূপটা যেমন খুঁজি, তেমনই আরও গভীরে গিয়ে দেখতে চাই, সেই পরিবেশে দৃশ্যকে কতটা সংকেতময় করে তোলা হল। সংকেতের এই আবরণই শিল্পকে হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতি বিকিরণে সাহায্য করে। তবে স্রষ্টার কাজ তো সেইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হল মানুষের অস্তিত্বকে জীবনের চলমানতার সঙ্গে মিলিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা। সে জন্য তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে জীবনসত্যকে পরিস্ফুট করতে চান।

অপরাজিত ছবিতে গঙ্গানদীকে ব্যবহার করা হয়েছে জীবনের দৈনন্দিনতার সঙ্গে এর ভূমিকাকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে। ঘাট থেকে তোলা নদীর ও নদী থেকে তোলা ঘাটের কয়েকটি দৃশ্যে প্রধান ঘটনার চারিদিকে অন্যান্য ঘটনাকে চলিষ্ণু রেখে জীবনের চলমানতাকে তুলে ধরা হয়েছে। বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন অপুকে প্রথমবার দেখি গঙ্গার ঘাটে। সে ঘুরে বেড়ায় নদীর ঘাটে, ঘাটের সিঁড়িতে। দেখতে পায় পালোয়ান, নৌকা, নানা বিচিত্র রকমের মানুষজন, আরও কত কী। *পথের পাঁচালী* ছবিতে নদী ছিল না। জল ছিল। ইন্দিরের নিঃসঙ্গ মৃত্যু আরও মর্মান্তিক চেহারা নেয়, যখন তার একমাত্র সম্বল তোবড়ানো ঘটিটি টালমাটালভাবে গড়াতে গড়াতে জলে গিয়ে পড়ে। বা বালক অপু গোপনে দিদির চুরি করা 'পুঁতির মালা'র অস্তিত্ব মুছে ফেলে পানা-পুকুরের জলে। জলের ওপর পানার আস্তরণ খুলে গিয়ে আবার ভরে যায়। যেন দিদির গোপন অপরাধের চিহ্নটুকুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরতরে নির্বাসিত করা। জলে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়ার আভাস দিয়ে ছবিতে তুমুল বর্ষা আসে। পুকুরের জলে ভাসে পদ্ম আর শাপলা, পত্রপল্লবের ওপর নেচে বেড়ায় ফড়িং, বাতাসে কাঁপে পদ্মপাতা। বাংলার সুজলা রূপ *পথের পাঁচালী*-র কাহিনিকে যেন তার পল্লিগ্রামের স্বাভাবিক আবেষ্টনীতে ধরে রেখেছে।

অপুর ছোট্ট জীবনে নদী দেখা এই প্রথম। হয়তো বিচিত্র এই সুন্দর প্রাকৃতিক রূপ তাকে অবচেতন মনে দিদি দুর্গার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। একদিন যেমন তারা দু'জনে ট্রেন দেখতে বেরিয়েছিল, তেমনই এই রূপময় নদীর বৈচিত্রে ভরা ঘাটে তারা দু'জনে ঘুরে বেড়াতে পারত। হয়তো ক্ষণিকের জন্যে বালক অপুর নিঃসঙ্গও লাগে।

হরিহরের রুজি-রোজগার এই ঘাটের ওপরেই। আমরা দেখি নিরন্তর প্রবহমান নদীর পাশে অনন্ত জীবনপ্রবাহ। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্মেষ ও বিনাশের নীরব সাক্ষী এই নদী। একদিন এই নদীর ঘাটেই হরিহরের জীবনসংকট দেখা দেয়। নদী তখন উত্তাল, আন্দোলিত জল ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে তীরে। পরবর্তী একটি দৃশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী তৃষ্ণার্ত বাবার মুখে জল দেওয়ার জন্য অপু ঘটি নিয়ে আসে খুব ভোরে এই নদীর কাছে। সূর্য তখনও ওঠেনি। ঘাট জনশূন্য। উদাসীনভাবে গঙ্গা বয়ে চলেছে পার্থিব সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করে, খেয়ালশূন্যভাবে। ব্যক্তিগত ভয় আশঙ্কা দুঃখ যেন তুচ্ছ হয়ে পড়ে বহমান নদীর প্রেক্ষাপটে। হরিহরের মৃত্যু ছবিতে রূপায়িত হয় অনবদ্য সংকেতময়তায়। ঘাট থেকে একঝাঁক পায়রার ভোরের আকাশে উঠে যাওয়া ও প্রেক্ষাপটে সর্বজয়ার সব খোয়ানোর হাহাকার ধ্বনির মাধ্যমে।

শবদাহের পর এই নদীকে সাক্ষী রেখেই অপু শোককে অতিক্রম করার সাহস অর্জন করে। একদিন সর্বজয়া আবার অপুকে সঙ্গে নিয়ে অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায় এই নদীকে পেছনে ফেলে রেখে। আবার আর একটি নদীর বুকে নৌকার রূপকল্পে আমরা টের পাই বুকভরা আশা নিয়ে সর্বজয়ার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার গ্রামে ফিরে আসা।

বড় হয়ে অপু কলকাতায় আসে কলেজে পড়তে। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে গঙ্গার পাশে বসে জাহাজের ভোঁ শব্দে অনুভব করে দূরদেশের আহ্বান। কিশোর বয়সে গঙ্গাকে দেখে কল্পনাপ্রবণ অপুর মনে হয়তো বিস্ময় জেগেছে— নদী কোথা থেকে আসে, নিরন্তর কোথায় বয়ে চলে, কোন অনাবিষ্কৃত অচেনা জগতে গিয়ে পৌঁছয়। সেই অজানা জগতের প্রতি টান অনুভব করা সত্ত্বেও গ্রামের বাড়িতে একা ফেলে আসা মায়ের প্রতি দায়িত্ববোধের জন্যে বন্ধুর কাছে 'কূপমণ্ডূক' অপবাদও স্বীকার করে নেয়। মার মৃত্যুর পর এই অতল জলের মধ্যে শোনে 'কালপুরুষ'-এর ডাক। সেই ডাকই তাকে জীবনে *'অপরাজিত'* হতে সাহায্য করে।

সত্যজিৎ রায় লিখছেন: *পথের পাঁচালী* ছবিতে নদী রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাখা হয়নি। অথচ বাংলার গ্রামে নদী থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পাশ দিয়ে নদী চলে গেছে, এবারে (*অপুর সংসার* ছবির জন্য) তাই এমন একটা গ্রাম চাইছিলাম।... কলকাতার লোকেশন-বাছাই শেষ হতে আমরা নদীর খোঁজে লেগে যাই। বিস্তর নদী দেখার পর শেষ পর্যন্ত মহেশগঞ্জ গ্রামে জলঙ্গী নদী আমাদের ভালো লেগে যায়।... লোকেশনটা একেবারে নিখুঁত। নদীও ঠিক এই রকমই চাইছিলাম। সরু নদী, দু'ধারে হলুদ সর্ষে খেত, তারই মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। নদীর মধ্যে নৌকোও

চোখে পড়ল। তাতে মনে হল, অপু তার বন্ধুর সঙ্গে যদি খানিকটা পথ নৌকো করে আসে তো বেশ হয়। কলকাতা থেকে দুই বন্ধু যে গ্রাম পর্যন্ত আসবে, এই যাত্রাপথটায় তা হলে একটা বৈচিত্র্য আসে (*অপুর পাঁচালী*/পৃষ্ঠা ১৫১)।

পরের ছবি *অপুর সংসার*-এ নদীর প্রসঙ্গ আরও গভীরভাবে তাৎপর্যময়। নদীর স্রোতের টান কোনও মানুষের ভাগ্যকে পরিচিত ক্ষেত্র থেকে অপ্রত্যাশিতের হাতে সমর্পণ করে। নদীর গতিপথের বিচিত্র ভঙ্গির মতো মানুষের জীবনকেও বৈচিত্রে ভরিয়ে তোলে। নোঙরহীন জীবনের খেয়াতরী যেন এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে গিয়ে ভেড়ে। 'আমার তরী ছিল চেনার কূলে,/বাঁধন যে তার গেল খুলে/তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল/কোন অচেনার ধারে।'

শহরে জীবনের দৈনন্দিনতায় ক্লান্ত অপুর জীবনে বন্ধু এসে পড়ে স্বপ্নদূতের মতো। টান মেরে অপুকে সে কলকাতা থেকে কয়েকটা দিনের জন্য নিয়ে যায় তার মামাতো বোনের বিয়েতে— খুলনার একটা গ্রামে। লোভ দেখায় 'তোর খুব ভালো লাগবে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। অজ পাড়াগাঁ, নদী, তাতে নৌকা— ধু-ধু করছে মাঠ, ধানের ক্ষেত, আমবন, বাঁশবন, তার মাঝে রাস্তা—।' শহর-জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা অপু আবার গ্রামজীবন দেখবে বলে রাজিও হয়ে যায়। আমরা জানি সেখানে অপেক্ষা করে আছে অপুর জীবনে এক আকস্মিক পট-পরিবর্তনের ঘটনা— প্রায় নাটকীয়ভাবেই।

নদীতে পালতোলা নৌকায় চড়ে বন্ধু পুলু অপুকে নিয়ে যায় খুলনার গ্রামে। নৌকায় বসে পুলু পড়ে অপুর লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের খসড়া। অপু তখন বাঁশিতে 'আমার সোনার বাংলা'র সুর বাজায়, তার পর আবৃত্তি করে ওঠে—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
...
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

পরের ঘটনাগুলি বিচার করে আমরা বুঝতে পারি নদী, নৌকা, মাঝি, কবিতা সব মিলিয়ে কী অসাধারণ এক অনুষঙ্গ রচনা করা হয়েছে এই দৃশ্যটিতে— আসন্ন আকস্মিকতার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে।

অপর্ণার বিয়ের প্রস্তুতিপর্ব চলাকালীন সময়ে অপু নদীর পাশে, গাছতলায়। আসন্ন সন্ধ্যায় সে মাথার নীচে *সঞ্চয়িতা* রেখে ঘুমে অচেতন। আমাদের জীবনের চরম মুহূর্তগুলি অনেক সময়েই ঘটনার পারম্পর্য মেনে আসে না। আকস্মিকতাই জীবনের রহস্য। সেই মুহূর্তে নদীর পাশ দিয়ে বর চলেছে পালকি চড়ে বরযাত্রীদের সঙ্গে। সঙ্গের ব্যান্ডপার্টি তখন সুর বাজাচ্ছে: 'হি ইজ এ জলি গুড ফেলো'। এই 'জলি গুড ফেলো'টি ছিল পাগল বর। অপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে অনিবার্য কারণেই হয় না। পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা হয়ে পুলু সমাধান খোঁজে, মুশকিল আসানের মতো অপুর কাছে। হতোদ্যম বর বরযাত্রীদের সঙ্গে তখন ফিরে চলেছে। বরের মুখে আক্ষেপ শুনি 'বাবা, আমার বিয়ে হবে না?' নদীপাশেই এভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় অপুর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ। কবিতার ইঙ্গিত ('কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের অন্বেষণে') যেন কোনও অনির্দিষ্টের বিধানে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়।

অপুর বিয়েতে অভিনব বাসর তৈরি হয় মেয়ের বাড়িতেই। জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরে নদীকে— যে নদী তাকে টেনে এনে এনেছে এই ঘটনার কেন্দ্রস্থলে। ঘরের মধ্যে ভেসে আসে নৌকার মাঝির গাওয়া ভাটিয়ালি গানের বিষণ্ণ সুর: 'ও বন্ধু রে ঘরবাড়ি ছাড়িলাম আমি, ছাড়িলাম দেশের মায়া... ফুলের মধু ফুলে রইল চঞ্চু যায় শুকাইয়া'। এও কি নিয়তির আরেক পূর্বাভাস?

ছবিতে নদী প্রসঙ্গ আবার ফিরে আসে কাহিনির চরম মুহূর্তে। অপর্ণার মৃত্যুর পর সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ অপু ছন্নছাড়া জীবনযাপন শুরু করে। নিঃসঙ্গ মানুষটি শোকের আকস্মিক ঝলসানি সহ্য করতে না পেরে উদ্দেশ্যহীনভাবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। এক সময় তাকে দেখা যায় সমুদ্রতটে, যে-সাগরে সে একদা পেত অতল জলের আহ্বান, আজ যেন তীরে আছড়ে পড়া প্রবহমান জলরাশি তার অব্যক্ত শোকোচ্ছ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে। পরে, এক সময়ে পুলুর জবরদস্তি ও যুক্তির কাছে সে পড়ে টানাপোড়েনে। অপর্ণার স্মৃতিকে অতিক্রম করে সে কাজলের অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছিল না। কিন্তু জীবনবিমুখ এই অস্বাভাবিক চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে অবশেষে সে মুক্তি পায়, সুস্থ স্বাভাবিক পিতৃত্বের অনুভবে। সে ফিরে আসে কাজলের কাছে। ইচ্ছে ছিল পুত্রের প্রতি সামান্য কর্তব্য পালন করেই ফিরে যাবে। কাজলের করুণ পরিস্থিতির ভয়াবহতা তাকে আকৃষ্ট করে তোলে ছেলের প্রতি, জীবনের প্রতি। কাজলের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় সেই 'বাসরঘরে'।

ঘরে ঢোকামাত্র ভাটিয়ালি গানের সুরের অনুষঙ্গে ফিরে আসে অপর্ণার স্মৃতি। অতীতের মধ্যে আটকে থাকা অপু কাজলকে দেখে বর্তমান বাস্তবতার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তার জীবনের গতিপথের পুনপরিবর্তনের নীরব সাক্ষী হিসেবে নদী তখনও পাশে। এই নদীকে সাক্ষী রেখেই সে তার উত্তরাধিকারকে কাঁধে নিয়ে রওনা দেয় নতুন জীবনের ইশারায়। প্রবহমান নদীপাশে বহমান মানবজীবন। প্রেক্ষাপটে সংগীতের মূর্ছনার সঙ্গে নিসর্গের এক অপরূপ মিলনদৃশ্য। অপু-অপর্ণা-কাজল এই ত্রিমুখ সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে নদী এ-ছবিতে যেন এক আশ্চর্য ভারসাম্য রেখেছে।

জলসাঘর ছবিতে ট্র্যাজেডির মূল সুর রচনা করে নদী। ছবিতে এক সময়ে দেখি, নদী রুদ্রমূর্তিতে ভয়ংকর। স্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার মধ্যে যেন ঐতিহাসিক সত্যপ্রমাণের ভূমিকা নেয়। একদা বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে গেলে নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদের জন্যে বিশ্বম্ভর রায়বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল। প্রতাপশালী জমিদার তখন প্রকৃতির ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করত না। তার প্রকৃতিগত বদান্যতায় প্রজারা আশ্রয় পেয়েছিল সে-যাত্রা। তবে দাম্ভিক বিশ্বম্ভর মূঢ়তায় সামাজিক সত্যকে উপেক্ষা করে। সে টের পায় না যে, চলতি সমাজব্যবস্থার ক্রান্তিকাল উপস্থিত। অবিমৃশ্যকারী জমিদার বিশ্বম্ভরের মুখে শুনি, 'জমি? কোথায় জমি? সবই তো জল। সব অতলে তলিয়ে গেছে। সব ভেসে গেছে। সব ভেসে গেছে।' তখন তার দম্ভের সুর পরিণত হয় আর্তনাদে। কূল ছাপিয়ে নদী শুধু জমিই নয়, তার স্ত্রী ও একমাত্র-উত্তরাধিকার তার 'বংশের প্রদীপ' খোকাকেও গ্রাস করে নেয়। মহাকাল যেন নদীমুখে বার্তা নিয়ে আসে এক ঐতিহাসিক অমোঘ পরিণামের। প্লাবনে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর নদী রেখে যায় তার দৌরাত্ম্যের চিহ্ন— শুকনো নদীচর। দুর্দশাগ্রস্ত বিশ্বম্ভর অভাবের টানে নদীচর ইজারা দিতে বাধ্য হয়। নদীর দৌরাত্ম্য তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় গান-বাজনার শখটুকুও কেড়ে নিয়েছে। 'সংগীতের আর প্রয়োজন নাই' এই হতশ্বাসে আমরা শুনি তাঁর সর্বস্ব খোয়া-যাওয়ার হাহাকার ধ্বনি।

দম্ভের শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ প্রতিভূদের একজন প্রতিনিধি বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যু ঘটে নদীচরে। ঘোড়ার পিঠ থেকে সে মুখ থুবড়ে পড়ে রিক্তভাবে। নীলরক্তের শেষ চিহ্নটুকু শুষে নেয় শুষ্ক নদীচর— যেন ঢেকে রাখে তার সম্মানহানির অমর্যাদাকে। নায়েব ও অনুচরের সঙ্গে ছুটে আসে মাঝিমাল্লারা। তারা বিস্মিত হয়ে দেখে ভূলুণ্ঠিত নীলরক্তের ধারা। নদীচরে নিঃশব্দে ঘটে যায় ইতিহাসের পট পরিবর্তন।

জলসাঘরের মতো *দেবী* ছবিরও সমাপ্তি মৃত্যুদৃশ্যে। লক্ষণীয়, এখানেও নদীপাশে। দয়াময়ী খোকাকে রাক্ষসের গল্প বলত— যে-রাক্ষস 'ছোট ছোট

ছেলেদের কচি কচি মাংস চিবিয়ে খায়'। খোকার মৃত্যুর পর বড় জা হরসুন্দরী দয়া সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে, 'রাক্ষুসি আমার ছেলেটাকে খেয়ে নিল গো।' পুণ্যবতী দয়ার মনে পাপের ছোঁয়া লাগে। খোকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সেও অনিশ্চিত। অস্তিত্বের সংকটে দিশেহারা দয়াময়ী পালাতে চায় এই জীবনহীন শৃঙ্খলিত বদ্ধ পরিবেশ থেকে, মর্মান্তিক ঘটনাস্থল থেকে, নিজের থেকে, আরোপিত অস্তিত্বের খোলস থেকে। বেরিয়ে যেতে চায় প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে। দয়াময়ী একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। স্বামী যেন অচেনা পূর্বজীবনের বন্ধনসূত্র। স্বামীর সান্নিধ্যে আসার অবস্থাটাও তার নেই, আজ আর সে স্বামীর কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত বোধ করে না। চারিদিক থেকে দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় ভাবে, সে দেবী, না কি রাক্ষুসি। অপ্রকৃতিস্থের মতো বলে, 'এরা আমাকে মেরে ফেলবে— খোকা...।' কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সর্ষেখেতের মধ্য দিয়ে দৌড়ে এসে সে নদীর ঘাটে পৌঁছায়, দেখে নদীর জলে গলে যাওয়া প্রতিমার কাঠামো। পুজো করা দেবীর মূর্তির অন্তিম রূপ। দয়ার দম বন্ধ হয়ে আসে। নদীর পারে খোলা প্রকৃতির মধ্যে সে শেষ নিশ্বাস ফেলে। প্রবহমান জীবনের মধ্যে একটি তাজা জীবন বিপন্ন অবস্থায় অকালে বিনাশ পায়। যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের জবরদস্তি প্রয়োগের নিষ্ঠুর পরিণাম সত্যকে উদঘাটিত করে একটি বিশেষ পারিবারিক ঘটনা থেকে সর্বজনীন সামাজিক স্তরে উত্তরণের মধ্যে।

দেবী ছবিতে নদীকে ব্যবহার করা হয়েছে নির্দিষ্ট শৈল্পিক চেতনায়। প্রথমবার বিস্তীর্ণ নদীর পটভূমিকায় উমাপ্রসাদ শহর থেকে শঙ্কিতচিত্তে বাবার কাছে আসে দয়ার মুক্তির দাবি নিয়ে। নদীর পটভূমিকায় লং শটে উমাপ্রসাদকে অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়।

মন্দিরে রুগ্ণ মৃতপ্রায় বালকটির 'দেবী'র চরণামৃত পান করার পর যখন জ্ঞান ফেরে, তখন বিজয়ের গৌরবে আত্মহারা কালীকিঙ্করের মত্ত উল্লাসের কাছে উমাপ্রসাদের প্রতিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। পড়ন্ত বেলার আবছা আলোয় সে ফিরে আসে শূন্য শোওয়ার ঘরে। সেখানেও মন্দির থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘণ্টার শব্দ তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। এই জীবনহীন পরিবেশ থেকে সে চলে আসে নদী-প্রান্তরে। মুখোমুখি হয় চলমান জীবনযাত্রার। দিনশেষে জেলেরা জাল কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় আলো জ্বলে ওঠে। উদার প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সান্নিধ্যে সে মনে সাহস সঞ্চয় করে ফিরে আসে ঘরে। দয়াকে নিয়ে সে পালিয়ে যেতে চায়। বাড়ির নির্দয় যুক্তিহীন বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে যুবতী বধূর জীবন বাঁচানোর জন্য মুক্তি খোঁজে নদীকে অবলম্বন করেই। দয়া রাজিও হয়। কিন্তু নদীকূলের শূন্যতায়, আজন্মকাল সংস্কারশাসিত নারীমন স্বামী ও সংসারের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্তব্ধ নির্জন নদীপ্রান্তরে

দয়ার মুখে 'আমি যদি দেবী হই' জিজ্ঞাসাটি যেন অপার্থিব স্বরের ছোঁয়া পায়। সংশয়ে উমা দয়াময়ীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তিনকন্যা ছবির *পোস্টমাস্টার* পর্বে নদীর প্রসঙ্গ আসে পরোক্ষভাবে। নতুনবাবু যখন অনাথ বালিকা রতনের স্নেহচ্ছায়ার বাঁধন খুলে একদিন হঠাৎ চলে যাওয়ার উপক্রম করে, তখন বালিকাটির ক্ষুদ্র চিত্তে অব্যক্ত দুঃখের অনুভূতি তীব্র ও গভীর। নতুনবাবু কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্যে নদীঘাটের দিকে পা বাড়ায়। অন্তহীন নদীর ও-পারে কোনও জগৎ আছে, ক্ষুদ্র গ্রাম্য-বালিকাটির কাছে তা সম্পূর্ণই অজানা। তাকে একা ফেলে রেখে কোথায় চলে যাবে নতুনবাবু চিরতরে? এই বিচ্ছেদ বালিকাটিকে তীব্র অভিমানিনী করে তোলে। নতুনবাবুর চলে যাওয়ার দৃশ্যে তার চিত্তের হাহাকার তাকে সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ করে তোলে।

ওই ছবির *মণিহারা* পর্বে আমরা ফণিভূষণ ও মণিমালিকাকে প্রথম দেখি তাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছনোর পর। খাঁ-খাঁ করা জনহীন বাড়িতে এসে মণিমালিকা জানালার কাছে যায়। তার চোখেমুখে বিষাদগ্রস্ততার সঙ্গে এক উৎকণ্ঠার ভাবও লক্ষ করি। স্বামী ফণিভূষণ মৃদু পায়ে তার পেছনে এসে দাঁড়ায়। স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ব্যক্তিত্বহীন আকুতির ছাপ তার হাবেভাবে। এমন সময়ে একটা পাখি ডেকে ওঠে। মণিমালিকা জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কী পাখি?' অপ্রস্তুত ফণিভূষণ উত্তর দিতে পারে না। বলে 'জানি না, তুমি বরং ভগীরথকে জিজ্ঞেস করো।' দক্ষিণী সিংহেন্দ্রমধ্যম সুরে বিন্যস্ত গানটির বন্দেশ পর্যায় এক করুণ সঙ্গীহীনতার রূপ নেয়। দূরে নদী দেখা যায়। দৃশ্যটিতে নদীর কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির অনিবার্য ডিটেল হিসেবে নদীর দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। নদী যেন বাইরের জগতের সঙ্গে এই গ্রামের যোগসূত্র। দৃশ্যটিতে অচেনা পাখির ডাক অচেনা জায়গায় যেন স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা নির্ধারিত করে দেয়। নদী যেন মণিমালিকার কাছে এই অচেনা পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সূত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সত্যজিৎ দৃশ্যটিতে নদীর শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। পরে স্বর্ণলোভী, স্নেহ-মমতাহীন, আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসন্তান, খণ্ডিত মানসিকতায় রুগ্‌ণা মণিমালিকা তার স্বামীর চরম সর্বনাশের সময় তার গয়না খোয়া যাওয়ার আশঙ্কায় অবিশ্বস্ত মধুসূদনকেই বেছে নেয় নিরাপত্তার জন্যে। তাদের পলায়ন-পথ রচনা করে নদী। ধূর্ত মধুসূদন লোভের বশে মণিমালিকাকে ডুবিয়ে মারতেও কুণ্ঠিত হয় না। অন্ধকার রাতে উদাসীন নদীর গভীরে সে-অপরাধকে চাপা দিতে চায়। তখন দূর থেকে ভেসে আসে যাত্রার অস্পষ্ট সংলাপ। জাগ্রত লোকচক্ষুর নেপথ্যে ঘটে যায় মধুসূদনের সঙ্গে গোপন অভিসন্ধির পরিণাম হিসেবে নদীবক্ষে মণিমালিকার মর্মান্তিক মৃত্যু।

সমাপ্তি-র কিশোরী মৃন্ময়ীর একমাত্র নিজস্ব আশ্রয়স্থল ছিল নদীঘাট। সেখানে একটা গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় চড়ে সে সময় কাটাতে ভালোবাসত। তার ছোট জীবনের সকল বিস্ময়, কল্পনা, দুরন্তপনা সব কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জড়িয়ে রেখেছিল তার গ্রামের নদীটি। নদী তার কাছে নানা খবর এনে দেয়, অচেনাকে চেনায়, জীবনকে জানায়। অমূল্যকে সে প্রথমবার দেখেছিল নদীর ঘাটে। দূর দেশ-শহর থেকে আসা এই শিক্ষিত যুবকটি ক্ষুদ্র গ্রামে আটকে থাকা বালিকাটির চিত্তে অনায়াসে বিস্ময়বোধ, সম্ভ্রমের সঙ্গে কৌতূহলও জাগিয়ে তোলে। এর থেকে ক্রমে স্বচ্ছন্দে গড়ে ওঠে ভালোবাসার মতো এক স্বাভাবিক অনুভূতি।

গ্রামের নদীটি ছিল মৃন্ময়ীর বাল্যজীবনের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অমূল্যর কলকাতা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ এক সময়ে মৃন্ময়ী নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করে। এই নিঃসঙ্গ বোধই তার মানসিক উত্তরণের চিহ্ন। ব্যবহারে সে তখন অনেক শান্ত ও সংযত। নদীর ঘাট তাকে আর আগের মতো টানে না। গ্রামজীবনের অনিবার্য ডিটেল হিসেব করা ছাড়াও, মৃন্ময়ীর বাল্যসময়ের সঙ্গে নদীকে জুড়ে দিয়ে ছবির পরিচালক শিল্পসম্মত সুষমায় মৃন্ময়ীর বয়ঃসন্ধিকে রূপায়িত করেছেন। অভিভাবকীয় শাসনে মৃন্ময়ী যখন ঘরে বন্দি, পরিচালকের ক্যামেরা তখন ঘুরে বেড়ায় মৃন্ময়ীর নিজস্ব জগতে— বটতলায় দোলনা, রথতলা, নদীর পার, পরিত্যক্ত এই পরিবেশ যেন 'স্টিল লাইফ' ছবির রূপ ধারণ করে। মৃন্ময়ীর ছোঁয়া লেগে থাকা দৃশ্যগুলিতে তার এখনকার অনুপস্থিতি আমাদের চোখে আরও প্রকট হয়। সে তার প্রিয় কাঠবেড়ালি 'চড়কি'কে পুড়িয়ে ফেলতে বলে নদীর ঘাটেই: 'ওকে নদীর ধারে নিয়ে যা, নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেল।' মৃন্ময়ীর হয়তো মনে হয়েছিল সেটাই হবে 'চড়কি'র স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের মতো। তার ফেলে-আসা সঙ্গীর সঙ্গে নিজের বাল্যজীবনকেও নদীতীরে চিরতরে নির্বাসিত করা।

মৃন্ময়ীর মতো চারুরও বাল্যজীবন কেটেছে নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাংলার কোনও এক গ্রামে। নদীর অসীম জলধারা কল্পনার সীমাকে বিস্তীর্ণ করে। মনকে করে সুদূরপিয়াসী। নদী তো নির্জন মানুষের নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গী। চিরকালই নদী মানুষের মুক্তির জায়গা। দুঃখের প্রতিবেদন সে শোনে নীরবে। চারুর পরিণত বয়সের কল্পনায় বাল্যস্মৃতির সূত্র ধরে ভিড় করে আসে নদীর চিত্রকল্প। অন্তঃপুরের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বহির্বিশ্ব হাতছানি দেয় নদীপথে। চারুর কল্পনার নদী সেই মুক্তির ইঙ্গিত। হায়, তার সে-বাসনা লেখার খাতার পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, বাস্তবে কোনও দিনও রূপায়িত হয় না। ছবির শেষ দিকে সমুদ্রতটে অসীম জলরাশির সামনে চারু ভূপতির প্রস্তাবে নতুন করে সৃষ্টির উদ্দীপনায় মেতে

ওঠে। কলকাতা ফিরে আসে নতুন কর্মসূচির টানে। পরবর্তী দৃশ্যে অমলের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতার বেদনায় চারু গোপন অশ্রুজলে যেন পায় সমুদ্রের নোনা জলের স্বাদ।

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে ভূতের রাজার বর পেয়ে গুপী-বাঘা তাদের ইচ্ছা পূরণের এক স্বর্ণমুহূর্তে পৌঁছয়। রাত্রিশেষে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে তারা জেগে ওঠে এক আলো-ঝলমল প্রকৃতির মধ্যে। 'সব পেয়েছির দেশে'র মতো পারিপার্শ্বিক বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে— গুপী একটি নদীর পাশে এসে দাঁড়ায়। ভোরের সূর্য যেন অপেক্ষা করে আছে তাকে অভ্যর্থনার জন্য। নদীর ওপারে সূর্য ওঠার বিস্ময় তার কণ্ঠে সুর ঢেলে দেয়। সে গান গেয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের সুরে: 'দ্যাখো রে, নয়ন মেলে/ জগতের বাহার/দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার/আহা মরি কী বাহার।' আনন্দে অভিভূত গুপী নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। সাধারণ হতমান দু'জন মানুষের অসামান্যের জগতে পৌঁছে যাওয়ার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে একটি নদী। গ্রামবাংলার রূপের পূর্ণতা এনে দেয় নদী তার পরিপার্শ্ব নিয়ে।

বাংলার এমন একটি পরিপূর্ণ রূপ দেখেছি তথ্যচিত্র *রবীন্দ্রনাথ*-এ। তুমুল বর্ষণে প্লাবিত পদ্মার দৃশ্যাবলি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে জলদগম্ভীর স্বরে গাওয়া 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' গানটির সহযোগে। নদী থেকে তোলা তীরবর্তী চলমান জীবনের প্রাণচঞ্চল দৃশ্যগুলি বাংলারই অন্তরাত্মার প্রকৃত রূপ। ছবির শেষ দৃশ্যটিতে রবীন্দ্রনাথের মহামানবের প্রতি বিদায় অভিবাদনটি পূর্ণ হয় অনন্ত সমুদ্রের পারে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে। *বালা* তথ্যচিত্রে পরিচালক ভরতনাট্যমের কালোত্তীর্ণ রূপকে চিত্রিত করেন সমুদ্রতটে বিপুল জলরাশির পরিপ্রেক্ষিতে।

অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে শুকনো পাহাড়ি নদীটি নানা দৃশ্যে ফিরে ফিরে আসে। এ-ছবিতে নদীকে একটা মোটিফের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে পালামৌ জঙ্গলে আসা চারজন যুবকের বাংলোর বারান্দা থেকে দেখা যায় কিছুটা দূরে ধু-ধু করা শুকনো নদী আর তার পেছনে পাহাড়। এ দুটির অবস্থান পরিবেশের নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। জনহীন পাহাড়ি নদীচরে মোষের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ শুনে জুটমিলের লেবার অফিসার সঞ্জয়ের, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* বইয়ে পড়া, 'বিষণ্ণতার ভাবে'র কথা মনে পড়ে। দুপুরে নির্জন বনভূমিতে এই বিষণ্ণ সুর যেন অর্থহীন জীবনের শূন্যতার প্রতিধ্বনি।

নদীকে আবার দেখা যায় মেমরি গেম খেলার সময়। নীরব নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতি। ছবির শেষ দিকে এই নদীরই পাশে অসীম অপর্ণার মুখোমুখি হয়। আত্মজিজ্ঞাসার জন্য নদীর সান্নিধ্যের মতো নির্ভরযোগ্য জায়গা আর কী আছে? নিরুত্তর নদীর কাছে

প্রশ্নের যেন এক অন্য মীমাংসা পাওয়া যায়। উদাসীন নিরপেক্ষ নদী যেন সব স্বীকারোক্তির গোপন আধার। কথায় কথায় ক্রমে দুজনের পরস্পরের কাছে স্বীকারোক্তির সময় আসে। মেমরি গেম খেলার সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাশক্তিটা ক্রমশ আলগা হতে থাকে। দৃশ্যে এক সময় অপর্ণার আঁজলা করা হাতে নদীর বালি আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে পড়ে। বাইরের সাজানো মুখোশটা খুলে ভেতরের মানুষটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। নদীচরের নিরাসক্ত শূন্য চেহারাটা যেন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক নির্ভরযোগ্য চিত্রকল্প রচনায় সাহায্য করে।

অশনি সংকেত-এর নদী ঘিরে থাকে একটি স্বচ্ছন্দ গ্রাম্যজীবনকে। তার জলধারা যেন প্রকৃতির সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা রূপটিকে মেলে ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ছবিতে মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের হাহাকারকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে।

জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে বেনারসের গঙ্গা আবার ফিরে আসে। বাংলার পল্লীজীবনের পটভূমিকায় তৈরি *অপরাজিত*-র পর অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছে এই দেশ, কাল। *জয় বাবা ফেলুনাথ* ছবির নির্মাণ ১৯৭৮-এ। এ-ছবিতে জীবনসংগ্রামের চিহ্ন নেই, আছে অপরাধজগতের মানুষের প্রতারকদের বুজরুকির সাহায্যে শোষণের চেহারা। ছবিতে লক্ষ করি পুণ্যতোয়া নদীর প্রকৃতির ওপর মানুষের আস্ফালন। নদীর ছন্দোময় রূপের মধ্যে টেনে আনে কুটিল চিন্তার চক্রান্ত। কলুষনাশিনী গঙ্গার বুকে ঘটে বৈভবের দম্ভপ্রকাশ। নদীর নীরবতা সে-পাপকে সহ্য করলেও মহাকাল তার দণ্ড দেয়।

গঙ্গার ব্যবহার করা হয়েছে *জন-অরণ্য* ছবিতেও। পুণ্যার্থীর মুখোশ পরে নটবর গঙ্গাস্নানের অছিলায় কোমর-জলে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মক্কেলের হাঁড়ির খবর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। *ঘরে বাইরে* ছবিতেও সন্দীপ তার চর লাগিয়ে নিখিলেশকে জব্দ করার জন্য মীরজানের বজরা ডুবিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল এই নদীর উদাসীনতার ওপর নির্ভর করেই।

সত্যজিতের শেষ ছবি *আগন্তুক*-এ মনমোহন তাঁর জীবনান্বেষণের ক্ষেত্র খুঁজে পান প্রকৃতির কোলে আশ্রিত মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে। পরিচালক ছবিতে সাঁওতালি নাচের দৃশ্যটিকে উপস্থাপন করেন কোপাই নদীর তীরে। প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে মানুষের মনের আসল রূপ প্রকাশিত হয়। সম্পর্কের দুরতিক্রম্যতা মুছে যায় মুহূর্তে।

ব্যবহারিক মাপকাঠিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচারের ভার থাকে মানুষেরই হাতে। নিরপেক্ষ প্রকৃতি সেই অর্থে নির্মোহ ও উদাসীন।

শান্তিনিকেতনে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে সত্যজিৎ শুনেছেন: 'প্রকৃতিকে স্টাডি করা মানে জীবনকে অ্যানালাইস করা।' প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের জীবনের নানা সত্যের সংকেত। জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সঠিকভাবে উন্মোচিত করতে হয়। এ-কাজটি একমাত্র শিল্পীরাই করতে পারেন। মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে পাই জীবনের প্রকৃত স্পন্দন। জীবনের পরিপূর্ণ রূপ।

বঙ্গজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নদী আমাদের নানাভাবে পুষ্ট করে রেখেছে। বাঙালির সুখ-দুঃখ, উন্মেষ ও বিকাশ, ধ্বংস আর সৃষ্টি, উত্থান-পতনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নদী। তাই বাংলার জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণে নদীর ভূমিকা বাদ দিয়ে শিল্পরচনা করা যে-কোনও শিল্পীর পক্ষেই অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়ও তাঁর ছবিতে নদীর চিত্রকল্পকে খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। সচেতনভাবে কথাটা বললাম এ জন্য যে, নদীকে বাদ দিয়েও দৃশ্যটিকে অন্যভাবে নির্বাচন করা যেত, কাহিনির খাতিরে নদীর কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, অথচ অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে বিষয়টিকে ব্যঞ্জনায় আরও অর্থময় করে তোলার জন্য এই নির্বাচন। তাঁর ছবিতে শুধু ডিটেল বা পৌনঃপুনিক ব্যবহারে একটি অনুষঙ্গ বা মোটিফ রচনা করা ছাড়াও, নদী কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতির ওপর স্পষ্ট মন্তব্য রাখে। ছবির চরিত্রের মতো এক অপরিহার্য অংশীদার হয়ে ওঠে। দৃশ্য সেখানে তার নিজস্ব সীমাবদ্ধ অর্থকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে সীমাহীনতায়, হয়ে ওঠে সংকেতময়।

সত্যজিতের খেরোর খাতা: দেবী

পাতার পর পাতা জুড়ে কাটাকুটি আর কাটাকুটি। একই দৃশ্য বারবার করে লেখা। সংশোধিত হচ্ছে কয়েকটি শব্দ। নতুন করে লেখা হচ্ছে লাইন, আবার সেটাকে পালটানো হচ্ছে। এভাবে চলছে চিত্রনাট্যের প্রস্তুতি। সংলাপ তো শুধু তথ্য জোগায় না, সংকেতও পাঠায়। ভাবের, চরিত্রের, মননের। সেই সংলাপ নিয়েই এত মকশো। চলচ্চিত্রে মজবুত করে তুলতে হয় দৃশ্যগঠনকে— চিত্রময়তায়। সেখানে একটিও বাড়তি শব্দের ভূমিকা নেই। বরং দশটা কথার বদলে একটি কথাতেই যদি কাজ হাসিল করা যায়, সচেতন ভাবে সে চেষ্টাই কীভাবে করে যেতে হয়— সত্যজিৎ রায়ের খেরোর খাতার দিকে নজর দিলে সে কথাই সবচেয়ে আগে মনে আসে।

সুকুমার রায়েরও একটা খেরোর খাতা ছিল, তার সাত রকম নামকরণ করেছিলেন তিনি। এমনি খাতা, হিজিবিজি খাতা, উড়ো খাতা, ফাল্‌তো খাতা, জাবেদা খাতা, খসড়া খাতা, বাজে খাতা। সুকুমারের সময় থেকেই, বোধ করি রায়চৌধুরী পরিবারে পাণ্ডুলিপির জন্য ব্যবহৃত খাতার নামকরণ করার চল শুরু হয়েছে। লীলা মজুমদার তো তাঁর আস্ত একটি বইয়ের নামকরণ করেন 'খেরোর খাতা'। চিত্রনাট্য লেখার জন্য সত্যজিতের খেরোর খাতা তো বিখ্যাত। নতুন ছবি করার পরিকল্পনা মাথায় এলেই কিনে আনা হত একখানা নতুন খাতা। চিত্রনাট্য লেখা শুরু করার থেকে ছবিতে আবহসংগীত জোড়া পর্যন্ত এ হত তাঁর নিত্যসঙ্গী। শুটিং-এর সময় দেখা যেত তিনি তন্ময় হয়ে পড়ছেন একখানা লাল রঙের খাতা। সম্পাদনার সময়

পাশে থাকত এই খাতাটি। সংগীত পরিচালনার সময়ও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন খাতাটিকে। খেরোর খাতা হল মোটা লাল সুতোর কাপড়ে বাঁধানো খাতা। এই খাতা সাধারণত ছোট ব্যবসায়ীদের হিসেব লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। কালীঘাটের একটি দোকান থেকে সত্যজিৎ রায় এ রকম খাতা নিয়মিত সংগ্রহ করতেন : মোটা সুতোয় সেলাই করা পুষ্ট কাগজে তৈরি এ জাতীয় পোক্ত খাতা ছিল সত্যজিতের খুব প্রিয়। তাঁর চিত্রনাট্য লেখার পাণ্ডুলিপি হিসেবে এই খাতাগুলো এখন রে-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আছে।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ও পরবর্তী সময়ে সন্দীপ রায়ের সৌজন্যে আমার কয়েকটি খেরোর খাতা দেখার সুযোগ হয়েছে। চিত্রনাট্যের খসড়া ছাড়াও নানা তথ্যে সমৃদ্ধ খাতাগুলিকে দেখতে পাওয়া এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আমাদের সব সময়েই কৌতূহল হয় সৃষ্টির পিছনে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্রষ্টার কোন মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, সেটা জানার। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আর-পাঁচজন মানুষের মতো হয়েও সৃষ্টিকর্মে কীভাবে এক অনির্বচনীয় অলৌকিকতার স্পর্শ দিয়ে যান সে রহস্য ভেদ করার। এ জন্য আমরা দ্বারস্থ হই স্রষ্টার কাছে, জেনে নিতে চাই তাঁর চিন্তা-ভাবনার অপরিজ্ঞাত সূত্রগুলির কথা। তিনি কিছুটা বলেন, কিছুটা বলেন না। কিছু কথা বলতে সক্ষম হন, কিছু কথা তাঁর বলার ক্ষমতার বাইরে থেকে যায়। আঁরি ক্লুজো 'দি মিস্ট্রি অব পিকাসো' ছবিটির শুরুতে যেমন বলেন "র‍্যাঁবো যখন 'দ্য ড্রাঙ্কেন বোট' লেখেন বা মোৎসার্ট যখন সিম্ফনি 'দ্য জুপিটর' রচনা করেন, তখন তাঁদের মনে কোন গোপন প্রক্রিয়া চলছিল যার হাতছানিতে তাঁরা এই দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে পেরেছেন, তার নেপথ্য কথা জানার জন্য আমরা আকুল হয়ে উঠি।" সত্যজিতের খেরোর খাতা থেকে, মনের কথার সবটা না হলেও আমরা তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনেকটাই জানতে পারি। জানতে পারি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের কথা, গভীর শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়ন্ত্রিত পরিমিতিবোধের কথা। নিরলস সাধনায় কী ভাবে তিনি নানা দিক থেকে বিচার-বিবেচনার পর বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে তার গভীরে চলে যেতেন। যার ফলে তাঁর শিল্পকর্ম হয়ে উঠত নিখুঁত ও পরিপাটি, প্রকাশভঙ্গিতে সংহত ও সংকেতময়।

আমার দেখা খেরোর খাতার একটি হল *দেবী* ছবির জন্য ব্যবহৃত খাতাটি। এই খেরোর খাতার দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগ লক্ষ করা যায়। প্রথম ভাগের শুরু অনিবার্যভাবে ছবির নাম ও চিত্রনাট্য লেখা আরম্ভ করার তারিখ দিয়ে। কোনও কোনও খাতায় দেখি কত নম্বর ছবি, তাঁর উল্লেখের। পরের পৃষ্ঠায় চরিত্রলিপি, সেই সঙ্গে সম্ভাব্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম। তার পর থাকে সেট ও লোকেশনের তালিকা। ইতিমধ্যে

তাঁর মনের মধ্যে ছবির দৃশ্যবিন্যাসের একটা প্রাথমিক ছক তৈরি হয়ে গেছে। এর পর থাকে ছবির জন্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসের তালিকা। ছবির ফ্রেমে সত্যজিৎ তুলে ধরেন এক চলমান জীবন। সেখানে প্রতিমুহূর্তে কিছু না কিছু ঘটছে। চরিত্ররা কোনও না কোনও কাজ করছে। এ সব দৃশ্যের জন্য, প্রয়োজন হয় চরিত্রের হাতের কাছে থাকা কোনও জিনিস, যা হবে দৃশ্যটির পক্ষে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ইঙ্গিতবহ। ইঙ্গিতবহ এ জন্য যে এর মাধ্যমে চরিত্রের মনের ভাব বা সেটা নিয়ে খুঁটিনাটি কাজকর্মে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরন দর্শকের কাছে আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিতান্তই চুপ করে বসে বা দাঁড়িয়ে না থেকে ছোটখাটো কাজের মধ্যে থাকলে অভিনেতাদের স্বাভাবিক অভিনয়ের পক্ষে সুবিধা হয়, আর তাতে চরিত্র বা দৃশ্যটিকে নিষ্প্রাণ লাগে না। ব্যবহারযোগ্য এইসব টুকরোটাকরা জিনিসকে সিনেমার পরিভাষায় বলে props (Property-র ভগ্নাংশ)। যেমন, *দেবী* ছবির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একটি পাখির। খেরোর খাতায় তিন জায়গায় লেখা দেখি, কাকাতুয়া, চন্দনা, টিয়া। তিনটিই টকিং বার্ড। যে কথা বলতে পারে। মূল চিত্রনাট্য ও ছবিতে চন্দনা পাখিকে দেখা যায়। দয়ার সঙ্গে পাখিটির সম্পর্ক ছবিতে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। কালীকিঙ্করের বাড়িতে দাঁড়ে বসা পাখিও এক প্রতীকী রূপ নেয়। দয়াময়ী খোকার আবদার রক্ষা করত নাড়ু দিয়ে ভুলিয়ে। এই 'নাড়ু কোথায় থাকবে' এ নজরও সত্যজিতের এড়ায়নি। কেননা, সেই স্থানটি নির্দিষ্ট হলে দৃশ্য হয়ে উঠবে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত। এ ছাড়া এই props-এর বিশদ বিবরণে পাই: ক্যাশমেমো রাখার স্ট্যান্ড/Paper knife/কেরোসিনের বোতল/হাত-পাখা/London-এর Print/শেক্সপিয়র থেকে একটা দৃশ্য/Group Photograph/নিজের Portrait/Calender/European Painting/Paper Weight/টিনের বাক্স। এ রকম আরও পাঁচ-ছ'টি তালিকা পাওয়া যায় খেরোর খাতার বিভিন্ন অংশে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইঙ্গিতপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে দৃশ্যপটকে আরও নিবিড় করে তোলা।

তথ্যনিষ্ঠায় সত্যজিৎ ছিলেন প্রবাদপ্রতিম, ধৈর্যশীল ও অসম্ভব মনোযোগী। নিজের চোখে না দেখে, নিজে বিচার না করে ভালোভাবে কোনও বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে তিনি কোনও কিছু গ্রহণ করতেন না। সে জন্য তাঁর লেখায় বা ছবিতে তথ্যগত ত্রুটি খুব একটা নজরে পড়ে না। *দেবী* ছবিটি হল একটি 'পিরিয়ড পিস।' উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকের প্রেক্ষাপটে রচিত ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনি। লক্ষণীয়, ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালটি ছিল সত্যজিতের খুব পছন্দের। তাঁর অনেকগুলি ছবিতেই এই সময়টা ফিরে ফিরে এসেছে। যেমন *জলসাঘর, চারুলতা, শতরঞ্জ কে খিলাড়ি*।

চলচ্চিত্রে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল একটা কংক্রিট চেহারা নেয়, সেখানে অস্পষ্টতার কোনও স্থান নেই। তাঁর মতে, 'স্থান কাল পাত্র ঘটনা মনের ভাব— সব কিছুর বর্ণনাতেই ডিটেলের প্রয়োজন হয়, এবং শিল্পীর অনুভূতির উপরেই এর সার্থকতা নির্ভর করে।' যেখানে কাহিনি কোনও একটি বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, সেখানে সেই সময়কে ছবির অবয়বে প্রতিফলিত করে তোলার জন্য বাড়ির গঠন, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, গৃহস্থালী জিনিসপত্র, জীবনযাত্রার ঢং, যানবাহন, বাইরের থেকে ভেসে আসা শব্দ— সব দৃষ্টিগ্রাহ্য শ্রুতিগ্রাহ্য ডিটেল্‌সকে সময়ের বিচারে বেছে নিতে হয়। এভাবেই কাহিনির চরিত্রগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচারে সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। *দেবী* ছবির জন্য প্রস্তুতিপর্বে সত্যজিৎ রায় খেরোর খাতার পাতার পর পাতা জুড়ে এঁকে রেখেছেন তদানীন্তন টানা পাখার ডিজাইন, বাড়ির নকশা, অন্দরমহলের খুঁটিনাটি, ভেতরকার আসবাবপত্রের ডিজাইন, কোনও কোনও চরিত্রের পোশাক পরা পূর্ণাঙ্গ ছবি।

খেরোর খাতার প্রথম ভাগে এ সব লেখা ও আঁকার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রের জন্য সম্ভাব্য কোনও অভিনেতার স্কেচ, বা কোনও অপরিচিত মানুষ এই চরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত মনে হলে তাদের নাম ও ঠিকানা, সঙ্গে ফোন নম্বর, লিপি ও পোস্টারের ডিজাইন, কোনও টুকরো তথ্য বা মন্তব্য, বা কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তত্ত্বতালাশ করতে হবে তার ফর্দ, পরে খোঁজখবর নেওয়ার পর সে বিষয়ের বিবরণ ও সিদ্ধান্ত বা কোনওখানে ছোটখাটো হাবভাব বা শারীরিক ভঙ্গিমা, ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য অভিনয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত। যেমন *দেবী* ছবিতে দয়াময়ীর যখন অভিষেক হয় তখন উমাপ্রসাদ কলকাতায়। হরসুন্দরীর পত্র মারফত এই দুঃসংবাদ সে পায়। এই ঘটনার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে সত্যজিৎ শুরু করেন উমাপ্রসাদ ও ভূদেবের (উমার সহপাঠী বন্ধু) একটি লঘু পরিহাসমুখর আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে। 'সধবার একাদশী' নাটকটি দেখে দুই বন্ধু উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরছে। ঘরে ঢুকে উমাপ্রসাদ হরসুন্দরীর লেখা চিঠিখানা লক্ষ করে। সে 'চিঠিটা আলোর তলায় ধরে পড়বে— হাতটা ওপরে ওঠাতে গিয়ে-বিছানায় বসে পড়বে— তারপর কিছুক্ষণ চিন্তিত।' এ ধরনের বিহেভিয়ারিস্টিক ডিটেল্‌স সম্পর্কে মন্তব্য খেরোর খাতায় অনেকই পাওয়া যায়। যেমন, 'কালীকিঙ্করের মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দেবী-নামোচ্চারণ' বা গায়ের 'নামাবলী খসে পড়া' (একটি বিশেষ মুহূর্তে) বা নিবারণের 'scene to be played in whispers— চিৎকারটা হবে নাতি চোখ মেলে চাইবার পর।' এ ধরনের ডিটেল্‌স-

এর মধ্য দিয়ে তিনি চাইছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুক্ষ অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকে দর্শকের কাছে তুলে ধরতে।

দেবী ছবিটিকে এভাবে সময়োপযোগী ডিটেল্স-এ সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি নানা উৎসের সন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাঁর Notes-এ লেখা 'লণ্ঠন-1880'। পাশে টেবল ল্যাম্পের নকশা আঁকা— দু'ধরনের ল্যাম্প। নকশার পাশে লেখা 'Illustrated London News Graphic' হয়তো এই বই ঘেঁটে এ-নকশার নমুনা দেখতে পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে বিজলি বাতি চালু হয়নি। গ্রামে তো বটেই, শহরেও ব্যবহার হত লণ্ঠনের বা টেবল ল্যাম্পের আলো। খাতায় অন্যত্র আরও মন্তব্য: 'Blotting paper ছিল— 1883'। 'ঘোড়ার ট্রাম— 1894, বেশিদিন টেঁকেনি।' 1880's থেকে CTC (ঘোড়ার ট্রামেও নিয়মের বিরুদ্ধে আরোহীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রথা চলত)'। ঘোড়ার গাড়ির প্রসঙ্গে লেখেন 'ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা— কানের দিকে ঝালর।' পাশে Calcutta Gazette' লেখাটি দেখে মনে হয় এটাই হয়তো এই তথ্যের উৎস। Bourne & Shephard-এর অভিলেখাগারও ছিল তাঁর গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্র।

দেবী ছবিতে লণ্ঠন ছিল। প্রফেসর তার বাড়িতে উমাপ্রসাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার আগে লণ্ঠন জ্বেলে নেয়। খেরোর খাতায় আঁকা লণ্ঠনটির আকৃতি ছবির আকৃতিরই মতো। প্রফেসরের টেবিলে Blotting paper-এর প্যাড ছিল। সেটা দোয়াত-কালি কলমের যুগ। তবে ছবিতে ঘোড়ার ট্রাম চোখে পড়েনি। যে সময়ের ঘটনা, তখন হয়তো ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে CTC (Calcutta Tramways Company) শুরু হয়েছে। তবে ঘোড়ার গাড়ির দৃশ্য ছিল— যে দৃশ্যে উমাপ্রসাদ (সৌমিত্র) বন্ধু ভূদেবের (অনিল) সঙ্গে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছে। গাড়ি বাড়ির কাছে এসে থামলে সহিস এসে দরজা খুলে দেয়। উমাপ্রসাদ গাড়ি থেকে নামে। এই দৃশ্যটির জন্য সত্যজিৎ কোচম্যান ও সহিসের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তাঁর Notes এ লেখা 'কোচম্যান— চুড়িদার পায়জামা, চাপকান, শামলা। সহিস— হাঁটুতে বাঁধা পায়জামা, চাপকান, শামলা (Coat— কোটের তলায় কী পরে?)-এ রকম একটি প্রশ্নও উঁকি মারছে তাঁর মনে।

গ্রামের যানবাহন বলতে তখন ছিল পালকি। কালীকিঙ্করের বাড়িতেও পালকি থাকা খুবই স্বাভাবিক। উমাপ্রসাদ নদীপথে কলকাতা থেকে বাড়ি আসার সময় নদীতীর থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় আমরা দু'-একটি পালকিও দেখি। তিনি তখনকার সময়ের লেখাপত্তর পড়ে পালকি সম্পর্কে বিবরণে লেখেন: 'পাল্কী বাড়ির অন্তঃপুরের ফটকে রাখা হইত। পাল্কীতে যিনি চড়িবেন তিনি ত চড়িলেন; তাহার

পর পাল্কীর উভয় পার্শ্বের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এবং তাহার সর্বাঙ্গ ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হইল। বালিশের 'খোল' যেমন, সেইরূপ পাল্কীর খোল হইল ঘেরাটোপ— সেটি ধনীর ধনবত্তার পরিমাণ অনুসারে বিচিত্র বস্ত্রখণ্ড সমূহে নির্মিত করিয়া তাহাকে কতকটা সুদৃশ্য করিবার অদ্ভুত চেষ্টা করা হইত। সঙ্গে একটি পরিচারিকা একখানি সুপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিয়া, পুরাতন দাসী হইলে সাধারণ কোন ক্রিয়াকর্মে প্রাপ্ত একখানি তসরের শাড়ি পরিয়া এক পার্শ্বে ছুটিয়া চলিবে; অপর পার্শ্বে বাড়ির কোন পুরাতন চাকর যথোপযুক্ত বেশ পরিহিত হইয়া ছুটিয়া চলিবে; এবং পাল্কীর সামনে চুড়িদার পায়জামা ও চাপকান পরিহিত ও চাপরাশধারী এক পুরাতন দ্বারবান মাথায় তকমা বিশিষ্ট শামলা পাগড়ী পরিয়া অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া চলিবে।'

দৃশ্যগ্রাহ্য ডিটেল্সকে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তাঁর গবেষণার এই হল নমুনা।

অথর্ববেদে স্বপ্ন বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে। অথর্ববেদ সংহিতায় ৬ষ্ঠ কাণ্ড: ৫ম অনুবাক-তৃতীয় সুক্ত ও ১৬শ কাণ্ড: ২য় অনুবাক-প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সুক্ত ছাড়াও ৭ম কাণ্ড: ৯ম অনুবাক-দ্বিতীয় সুক্ত ও ১৯শ কাণ্ড: ৭ম অনুবাক-দ্বিতীয়-সুক্তে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায়। স্বপ্নের উৎপত্তি, জীবশরীরে তার প্রভাব; দুঃস্বপ্নের কারণ ও নিরাময়ের উপায় নিয়ে এই শ্লোক।

সত্যজিৎ রায় বোধহয় এই শ্লোকের হদিশ পেয়ে *দেবী* ছবিটি তৈরি করার সময় সেগুলো পড়ে নিতে চেয়েছিলেন। খেরোর খাতায় তাঁর Notes-এ লেখা— 'স্বপ্নাধ্যায়-অথর্ববেদ/পরিশিষ্ট ৬৮।... The Parisisthas of Atharvaveda-Bolling/ Negelien... Dream Superistitions of Hindus-Negelien... মৎস, মার্কণ্ডেয়, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্বপ্ন সম্পর্কে শ্লোক আছে।'

মানুষের স্বপ্ন দেখা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। চেতন-অবচেতন-অচেতন মনের সুপ্ত বা অবদমিত ইচ্ছা বা কামনা বাসনার প্রতিফলন ঘটে এই স্বপ্নে। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে শারীরিক কারণও যুক্ত। জীবনযাপনের ধরন, চিন্তা-ভাবনার গতিপ্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস স্বপ্ন দেখার কারণ হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নের বিষয় নিয়ে নানা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। তবে, স্বপ্নে দেখা বিষয়কে প্রত্যাদেশ বলে ভাবা ও তার প্রভাব নিয়ে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হল এক ধরনের কুসংস্কার। আর এই কুসংস্কারের প্রভাবে অন্য একটি জীবন যদি জড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা হয়ে যায় ঘোরতর অন্যায়। এই কুসংস্কারের পেছনে কালীকিঙ্করকে ধর্মশাস্ত্র বা তার ধর্মীয় জীবনযাপন কতটা প্রভাবান্বিত করতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়ার

জন্যই বোধহয় সত্যজিতের এই অনুসন্ধান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে: প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনমাত্র জাগরিত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নিদ্রালু ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনান্তে যদি নিদ্রিত হয় তাহা হইলে স্বপ্নজ ফল লাভ করিতে পারে না। সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

চিত্রনাট্যের প্রাথমিক খসড়ায় কালীকিঙ্করের সংলাপে ছিল: 'দেহের সব লক্ষণই সব লক্ষণ নয় উমাপ্রসাদ। আমি স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নলক্ষণ আমার জানা আছে— আমার তাতে বিশ্বাস আছে।' আরেকটা খসড়ায় কালীকিঙ্কর ও উমাপ্রসাদের কথোপকথন এভাবে লেখা:

'আমার বেদপুরাণে বিশ্বাস আছে— আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করি— শুধু শাস্ত্রে আছে বলে নয়— আমি পূর্বেও ইঙ্গিত পেয়েছি।' অন্যত্র তিনি লিখেছেন: 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্বপ্নাধ্যায়ে কী বর্ণনা আছে, জানো?

—জানি।

—জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি বিশ্বাস করো না, বোধহয়?

—বিশ্বাস করার প্রয়োজন দেখি না, ও নিয়ে ভাবিনি।

—সে ভেবো না। তোমায় আমি ভাবতে বলছি না, ও নিয়ে ভাবাটা হয়তো তোমার পক্ষে কাম্যও নয়— তবে আমি যে সব নির্দেশ পাই আমাকে সেই অনুযায়ী পন্থা ভেবে নিতে হবে।'

ছবিতে স্বপ্ন দেখার আগের দৃশ্যগুলিকে সত্যজিৎ তৈরি করেন স্বাভাবিক দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে যে মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে তার দিকে নজর দিয়ে। দয়াময়ীর শ্বশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেওয়া, কালীকিঙ্করের সঙ্গে দয়ার কথোপকথন, উমাপ্রসাদের প্রসঙ্গ, দয়ার আড়ষ্ট ভাব, কালীকিঙ্করের উমা-দয়ার সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহল, কুণ্ঠিত দয়ার লজ্জা পেয়ে উঠে পড়া, যাওয়ার সময় পিকদানিতে পায়ের ধাক্কা লাগা, কালীকিঙ্করের মুখে হাসির ছোঁয়া, রাত্রে শোওয়ার আগে বিছানায় মাথার উপর টানানো কালীর ছবিকে প্রার্থনা, জানালার ফাঁক দিয়ে ক্রমশ ভোরের আলো ফুটে ওঠা, প্রাতঃকালের সময় নির্ণয়ে ঘড়িতে ঘণ্টার শব্দ, বাড়ির ঝাড়লণ্ঠন, স্বপ্নদর্শন, কালীকিঙ্করের ঘুমের ব্যাঘাত, বিছানায় ছটফটানি, বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে খাটের ডাণ্ডা ধরে সামলে নেওয়া, খাটের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে

স্বপ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, চোখে জল, 'মা মা' বলে ডেকে উঠে দেয়ালে টাঙানো কালীর ছবির দিকে চোখ ঘুরিয়ে দয়াময়ীর কথা চিন্তা করা— এই সব খুঁটিনাটিকে নানান সংশোধনের পর ছবির জন্য তৈরি চিত্রনাট্য লিখেছেন খেরোর খাতায়। লক্ষণীয়, স্বপ্ন দেখার দৃশ্যের ঘড়ির ঘণ্টার মারফত পরিচালক সময়কে বুঝিয়েছেন যে ভোর হয়ে আসছে। স্বপ্ন দেখার পর সে স্বপ্ন ফলপ্রদ হয়ে ওঠার আশায় কালীকিঙ্কর বিছানা ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে।

এই ছবিতে সত্যজিৎ দুটি গানের ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি রামপ্রসাদী, দ্বিতীয়টিকে ওই ঢঙে তিনি নিজেই লিখেছেন। হয়তো কথার মাধ্যমে যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সে রকম গান খুঁজে পাননি। খাতায় প্রথম পাঁচটি রামপ্রসাদী গানের তালিকা দেখতে পাই (১) মন গরিবের কী দোষ আছে (২) জয় কালী জয় কালী বল (৩) মা মা বলে আর ডাকব না (৪) করুণাময়ী, কে বলে তোরে দয়াময়ী (৫) এই নিবেদন করি কালী। এর মধ্য থেকে তৃতীয় গানটি বাছেন। এক দীনদরিদ্রের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের জন্য মার প্রতি ভক্তিপূর্ণ অনাস্থা। ছবির দ্বিতীয় গানটিতে (তাঁর লেখা) সেই সংশয়ের সম্পূর্ণ অবসান।

দেবীত্ব প্রাপ্তির পর দয়াময়ীর মা-বাবা কী অবস্থায় থাকতে পারে এ-ভাবনা সত্যজিতের হয়েছিল। তিনি লেখেন: "দয়ার মা-বাবা কোথায়। মেয়ের দেবীত্বপ্রাপ্তির পর তারা কী করবে?" কোনও কারণে এ প্রসঙ্গ তিনি ছবিতে আনেননি।

তবে, দেবীত্বপ্রাপ্তির পর দয়াময়ীর অভিষেকের দৃশ্যটির গুরুত্ব ভেবেই এর পদ্ধতিগত দিকটিকে সত্যজিৎ খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন। 'দয়াময়ীর প্রথমদিন অভিষেক হবে কি? সেটা কীভাবে হবে? আরতি? পুরোহিত করবে? কালীকিঙ্করের কাজ কী? আর কে কে থাকবে? দর্শন কখন? নাটমন্দিরে অবারিত দ্বার? চরণামৃত সেবন কী ভাবে? আরতির সময় দর্শকভক্ত থাকতে পারে? আরতির শেষ কী ভাবে? দয়াময়ী অজ্ঞান হচ্ছে। (details)'

ছবিতে সত্যজিৎ আরতির শুরু থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়া পর্যন্ত দৃশ্যগুলিকে চব্বিশটি শটে ভাগ করেছেন। প্রথম ন'টি শটে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চপ্রদীপের ব্যবহার, পরবর্তী শটগুলিতে ক্রমে আসে কর্পূর, শঙ্খ, বস্ত্র, ফুল, চামর দিয়ে দেবীর আরাধনা। একুশ নম্বর শটের থেকে দয়ার dizzy লাগা, পরে টলায়মান অবস্থায় সামলাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়া। দেবীর অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর কালীকিঙ্করের ঈষৎ ঘোর কাটিয়ে দয়ার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি না করে ধর্মীয় সংস্কারে একে 'সমাধিস্থ' অবস্থা বলে মনে করে 'মা' 'মা' ডাকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার দৃশ্যগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই খেরোর খাতায়।

দয়াময়ীর দেবীত্বপ্রাপ্তির খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় করে। সময়ের এই অতিপাতকে সত্যজিৎ রায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন দেবীর ঘোমটার তারতম্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখায় পাই:

দেবীর ঘোমটা

১। প্রথম দিন— ঘোমটা নামানো— প্রায় মুখ দেখা যায় না

২। দ্বিতীয় দিন— নিবারণ আসে— ঘোমটা আর একটু খোলা—
MS এ মুখ দেখা যায়

৩। তৃতীয় দিন— উমা দেখছে (Same as 2)

৪। চতুর্থ দিন— ভীড়। রামপ্রসাদি গান first stage— ঘোমটা অর্ধেক খোলা।

৫। পঞ্চম দিন— উঠোন Full। রামপ্রসাদি গান 2nd stage— ঘোমটা খোলা।

ঘোমটার এই তারত্যম্যের মধ্যে দয়াময়ীর প্রথম দিককার আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠে নিজের দেবীত্বের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠার লক্ষণ বলেও ধরে নেওয়া যায়।

বাড়ির ধর্মীয় পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি লেখেন: দৈনিক পূজা কালীকিঙ্কর করেন— পুরোহিত থাকার প্রয়োজন আছে? আর কে থাকবে? দয়াময়ী কীভাবে পুজোর কাজে সাহায্য করবে? সামগ্রী কী কী? পদ্ধতি কী? চণ্ডীপাঠ কখন? কী ভাবে? কোন অংশ সবচেয়ে ভাল? (এ জন্য তিনি বেছে নেন, শ্রী শ্রী চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়— শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতির তৃতীয় শ্লোক: দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা/ নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।/তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষিপূজ্যাং/ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূতা মূর্তি যে দেবী স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সমস্ত দেব ও ঋষিগণের আরাধ্য এই অম্বিকাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন।— (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত। উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা) সন্ধ্যারতি পুরোহিতই করবে? আর কে কে থাকবে? কালীকিঙ্করের অংশ কী?' শেষ লাইনটি নিম্নরেখার দ্বারা সত্যজিৎ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কালীকিঙ্করকে রঘুবংশম থেকে আবৃত্তি করতে শোনা যায়। তাঁর যে মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়নি, স্মৃতিশক্তি এখনও অটুট, সেটা প্রমাণ করার জন্য উমাপ্রসাদকে তিনি আবৃত্তি শোনান, মন্দিরে তখন একটি মৃতপ্রায় বালককে দেবীর চরণামৃত পান করানো হচ্ছে। ছবির এই বিশেষ উদ্বেগময়

পরিস্থিতিতে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ যেমন একটা আবহাওয়ার তৈরি করে— তেমনই নেপথ্য ঘটনাকে ঘটতে দেওয়ার জন্য সময় অতিবাহনের এই নাটকীয় ব্যবহার দর্শকের উৎকণ্ঠাকে আরও তীব্র করে তোলে। কালীকিঙ্করের আবৃত্তির জন্য সত্যজিৎ রঘুবংশম থেকে আরও দুটি অংশকে বাছেন। ছবির জন্য নির্বাচিত অংশটিতে পিতৃমহিমার কথাই বলা হয়েছে।

দেবী ছবিটি শুরু হয় দুর্গাপূজার দৃশ্য দিয়ে। দৃশ্যনির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে তিনি লেখেন— 'দুর্গাপূজার কোন অংশ ছবির পক্ষে সবচেয়ে ভালো? (পরে আর এক জায়গায় লেখেন: পূজার Processটা দেখে shot plan করতে হবে) তাতে কালীকিঙ্করের সবচেয়ে impressive অংশ কী? বলি কখন আসছে? পুরোহিত ছাড়া আর কে থাকবে? কী বাজবে? ছেলেরা কোথায়? ভাসানে কালীকিঙ্কর যাবেন।'

দুর্গাপূজার দৃশ্যেও তিনি আরতির অংশটিকে বাছেন। তাঁর মনে হয়েছে ছবির জন্য পূজার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে এই অংশটিই সবচেয়ে উপভোগ্য ও সরগরম। ধূপধুনো, কাঁসরঘণ্টা, ঢাক, প্রদীপ সব মিলিয়ে ছবির দৃশ্যরূপের শুরু থেকেই এক মোহময় পরিবেশ তৈরি হয়। বলির জন্য উদ্যত খাঁড়া নেমে আসার দৃশ্যটির পরেই চকিতে আকাশে হাউই বাজি উড়ে যাওয়া যেন ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠারই শৈল্পিক প্রতীকী রূপ।

**

খেরোর খাতায় দ্বিতীয় ভাগে আছে দৃশ্য-বিভাজনের বর্ণনা। এক-একটি দৃশ্য ছবিতে সময়ের পরিমাপে পর্দায় কতক্ষণ স্থায়ী হবে তার হিসেব। তা ছাড়া আছে, ক্যামেরার গতিশীলতার গ্রাফিক নির্দেশ। তাঁর মতে, দৃশ্যবস্তুর থেকে ক্যামেরার দূরত্বের তারতম্য ঘটিয়ে বা শটের দৈর্ঘ্যের তারতম্যের সঙ্গে বিষয়বস্তুর ভাববৈচিত্রের সমন্বয়ে ছবিতে একটা মিশ্র ছন্দ আনা যায়। অন্য দিকে, ক্লোজআপে পুরো দৃশ্যটির যে আবেগ তার সবখানি অনেক সময় ধরা পড়ে না, আবার ক্যামেরা দৃশ্যবস্তু থেকে খুব দূরে চলে গেলে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি নিস্তেজ হয়ে পড়তে পারে। সিনেমায় ক্যামেরার মাধ্যমে কাহিনিকে ব্যক্ত করা হলেও, দর্শকের কাছে ক্যামেরার উপস্থিতিকে যতটা আড়াল করে রাখা যায় ততটাই ভালো। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার সময় বা একই দৃশ্যকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সময় তিনি চেষ্টা করতেন কখন ক্যামেরার অবস্থান বদলে গেল সেটা দর্শককে বুঝতে না দেওয়া। আমাদের চোখ যেমন দেখার আগ্রহ অনুযায়ী বিষয়কে অনুসরণ করার জন্য দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে সরে সরে যায়, তেমনই ক্যামেরার দৃষ্টিকোণও পালটায় দর্শকের দেখার আগ্রহের

চাহিদা অনুযায়ী। অনেক সময়ই পরিচালক নিজের পরিকল্পনামত বিষয় ও ভাবের গুরুত্ব অনুযায়ী দর্শকের মধ্যে সেই চাহিদাকে গড়ে তোলেন। কোনও সময় আবার সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে একটি বিষয়কে বলে যাওয়ার জন্য ক্যামেরার দৃষ্টিকোণও হয় যেন নিরপেক্ষ।

তাই দৃশ্যবিন্যাসে বিষয়ভাবের গুরুত্ব অনুযায়ী কোথায় শট পালটাবে, কোন অ্যাঙ্গেলে ও কতটা দূরত্বে ক্যামেরা বসবে, বাইরের থেকে আসা শব্দ (incidental sounds) কোথায় জুড়তে হবে, এ সব কিছুর প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই এই পর্বে। এটাই তাঁর শুটিং স্ক্রিপ্ট, এখানে পাতা জুড়ে দেখা যায় প্রতিটি ফ্রেমের সেই সব বহু-পরিচিত স্কেচ। চলচ্চিত্রে ক্যামেরাই যেহেতু বর্ণনাদাতার ভূমিকা নেয়, আর যেহেতু কোনও ঘটনাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার ভার থাকে ক্যামেরার সার্থক ব্যবহারের মধ্যে, তাই তিনি শুটিং করতে যাবার আগে যতটা সম্ভব কল্পনার থেকে চিত্রকল্প এঁকে রাখতেন তাঁর খেরোর খাতায়। পরিবর্তন কি আর হত না? হত নিঃসন্দেহে। তবে তার জন্য হোমওয়ার্ক-এর কোনও খামতি নেই।

আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে নজরে পড়ে সেটা হল কাহিনির সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের পদ্ধতি। সত্যজিৎ রায় যখন অন্য কোনও সাহিত্যিকের গল্প বা উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছেন তখন সেই লেখাকে বারবার পড়ে, মনের মধ্যে গল্পের বিষয় ও চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নিতেন। তাঁর মতে, একটি চলচ্চিত্রকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় একটি আঁটসাঁট চিত্রনাট্যের। আর চিত্রনাট্য লিখতে হয় চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই। সাহিত্য থেকে কাহিনিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার সময় ছবির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বর্জন করে ঘটনাক্রমকে এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হয় যাতে ছবির কাহিনিতে একটা নতুন বুনট তৈরি হয়। বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী ছবির বর্ণনাভঙ্গিকে বাছাই করে নিতে হয়। এই বর্ণনাভঙ্গিই ছবির মেজাজ তৈরি করতে সাহায্য করে। *দেবীর* মতো গল্পে প্লট হল গৌণ। এখানে মুখ্য হল প্রধান চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ ছবির ভাষায় করার জন্য সাহিত্যের ঘটনার অবলম্বন থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন ধরনের দৃশ্যনির্ভর ঘটনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনে এসে পড়েছে নতুন চরিত্র বা নতুন ঘটনা।

গল্পের কাহিনির থেকে ছবির ঘটনা যেখানে আলাদা বা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংযোজিত, সে সব দৃশ্যগুলিকে তিনি প্রথমেই লিখতে শুরু করতেন। খেরোর খাতায় প্রথম পর্ব থেকেই এই লেখার শুরু। এখানে লেখা-দৃশ্যগুলি যেন কিছুটা পারম্পর্যের

নিয়ম না মেনে লেখা। অর্থাৎ, কাহিনির সূত্র ধরে দৃশ্যগুলি ক্রমানুসারে লেখা হয়নি। যে ভাবটা মনে পড়েছে দৃশ্যের আকারে সেটাকেই দ্রুত লিখে রাখছেন। মকশো করা এই দৃশ্যগুলি বারবার লিখে (গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলি এমনকী পনেরো-ষোলোবারও লেখা) সংলাপকে ক্রমশ করে তোলেন সংহত, মুখের ভাষার মতো সহজ ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর ছবিতে সংলাপ প্রধানত তিন ধরনের কাজ করে, যে জন্য প্রতিটি কথাই হয়ে ওঠে অপরিহার্য। এক, চরিত্রকে আরও স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে। দুই, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে ও তিন, ঘটনার অভিঘাতে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নতুন নতুন তথ্যের সূত্র ধরে। 'পিরিয়ড পিস' ছবিতে সংলাপ আরও একটা বাড়তি ভূমিকা পালন করে। সেখানে কথাবার্তা বলার ধরনে, শব্দ নির্বাচনে, প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন জীবনযাত্রা, সমাজ ব্যবস্থা ও ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায়।

সংলাপ লেখার সময় তাঁর নজরে থাকত, কথার আশ্রয় না নিয়ে দৃশ্যগতভাবে সূক্ষ্ম অভিনয়ের সাহায্যে চরিত্রের অন্তরের ভাবকে কতটা পরিস্ফুট করে তোলা যায়। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তিনি নজর দিতেন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও behaviourism-এর দিকে। তাঁর মতে, 'তীব্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও গভীর অনুভূতির সংমিশ্রণে একজন পরিচালক মানুষের মনের দরজাটি ক্যামেরার সামনে তুলে ধরতে পারেন।' এই দৃশ্য পরম্পরাকে সাজিয়ে তোলার সময় তিনি জানতেন যে ছবির কাহিনির নাট্যরস প্রধানত ক্যামেরা ও এডিটিং-এর বিশেষ বিশেষ ব্যবহারেই ফুটে ওঠে, তার জন্য অভিনয় বা সংলাপকে নাটকের সুরে বাঁধার কোনও প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া চরিত্রগুলির সংলাপ বলা ব্যতীত, অন্যের কথা শুনে বা ব্যবহারে যে প্রতিক্রিয়া হয়, বা যখন চরিত্রের পাশ কাটিয়ে ক্যামেরা অন্য কোনও বস্তুর উপর ফোকাস করে, তখন পর্দায় প্রকাশ পায় এক প্রবহমান জীবন, দৃশ্যগুলি হয়ে ওঠে নিটোল ও ব্যঞ্জনাময়। তাঁর খেরোর খাতায় সংলাপের পাশাপাশি 'reacts' শব্দটির বহুল ব্যবহার থেকে বুঝতে পারি যে শুধু সংলাপই নয়, এই ব্যবহারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ববর্তী চলমান জীবনের টুকরো দৃশ্যগুলি থেকেই ফুটিয়ে তুলতে চান একটি সম্পর্ক বা সম্পর্কের টানাপোড়েন।

দেবী গল্পটি লেখা হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (খ্রি ১৮৯৯)। ঘটনাকাল 'আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা'। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের ঘটনা। গল্পের উমাপ্রসাদ গ্রামের বাড়িতেই থাকে। ইদানীং সে 'সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' ইচ্ছা 'পশ্চিমে যাবে চাকরি করিতে।' সত্যজিৎ রায়ের *দেবী* ছবির কাহিনির বিন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে। ঘটনাটি

ঘটে একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে। গ্রামীণ পটভূমিতে। পারিবারিক মনোভঙ্গি ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক প্রথায় কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সময়ের বিচারে তখন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুগসন্ধিক্ষণ। ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুব সমাজের মন তখন বিশ্বাসের চাইতে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। পরিবার ছেড়ে পরবর্তী প্রজন্ম শহরে যাচ্ছে ফারসি নয়, ইংরেজি বিদ্যা শেখার জন্য। তাই ছবিতে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে কলকাতার ঘটনাবলি। জমির উপর নির্ভরশীল জীবিকার বাইরে শিক্ষানির্ভর পেশার দিকে ঝুঁকছে যুবকেরা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওর আর্দশে উদ্বুদ্ধ তারা। যুক্তিকে অবলম্বন করে তৈরি হচ্ছে ভিন্নতর মতবাদ ও আদর্শ। পারিবারিক বাঁধন সেই আদর্শের চাপে আলগা হয়ে পড়ছে। সমাজে বিধবা-বিবাহ চালু হয়েছে, ধর্মান্তরিত হচ্ছে যুক্তিবাদী মানুষেরা, বিদ্রোহ হচ্ছে পরিবারের মধ্যে— পিতার অনুশাসনই শেষ কথা নয়। মূল্যবোধের এই বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার রূপায়ণ *দেবী* কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এ জন্য, সত্যজিতের ছবিতে উমাপ্রসাদকে বাড়িছাড়া করতে হয়েছে। ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্যে দেখি, স্ত্রী দয়াময়ী তাকে যাতে রোজ চিঠি লেখে এ নিয়ে তোড়জোড় চলছে। দৈহিক সান্নিধ্য থেকে দূরত্বে যাওয়ার মুহূর্তে কামনার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে এই দুই নরনারীর সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্যটি গুরুত্ব পায়, পরবর্তী দৃশ্যে দয়াময়ীর দেবীত্ব প্রাপ্তির মতো এক অবাস্তব পরিণতির উপস্থাপনা কালীকিঙ্করের জেদি ও যুক্তিহীন আচরণের অবিমৃশ্যকারিতাকে প্রমাণ করার জন্য। এই দৃশ্যটিকে ছবির জন্য নতুন করে লিখতে হয়েছে। খেরোর খাতার প্রথম দিকে দেখতে পাই বিচ্ছিন্নভাবে লেখা এই দৃশ্যটির খসড়া ও তার নানা সংশোধন। গল্পে, দয়াময়ী দেবীত্বে অভিষিক্ত হওয়ার পর উমাপ্রসাদ তাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। তার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সে (উমাপ্রসাদ) 'নিশীথের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না।' ছবিতে, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে উমাপ্রসাদের অবর্তমানে, তখন সে কলকাতায়। হরসুন্দরীর (বৌদি) পত্র মারফত খবরটা পেয়ে সে গ্রামের বাড়িতে আসে। বাবা কালীকিঙ্করের সঙ্গে একটি সংঘাতের দৃশ্যও রচনা করতে হয়।

কলকাতার ঘটনাবলির জন্য দুটি দৃশ্যের সংযোজন করতে হয়েছে। *সধবার একাদশী* নাটকের অভিনয় দৃশ্য দিয়ে তার শুরু। ভূদেব (নতুন চরিত্র, উমাপ্রসাদের কলেজের বন্ধু) ও উমাপ্রসাদ স্টেজ বক্সে। নাটকের নির্বাচিত সংলাপগুলিও লক্ষণীয়। এখানে ইয়ার বন্ধুদের মশকরায় বাবা চরিত্রও জড়িয়ে পড়ে। তদানীন্তন পিতৃতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থায় বাবার কর্তৃত্বকে প্রহসনের রূপকে খর্ব করে ইয়ারবন্ধুদের রসিকতার আসরে নামিয়ে আনা হয়েছে। দুই বন্ধু বাড়ি ফিরে আসে। সেখানে শোনা যায় ভূদেবের সমস্যার কথা। ছবিতে আসে তৎকালীন প্রসঙ্গ— বিধবাবিবাহ। উমাপ্রসাদ সাহস জোগায়। সে ডিবেট করে। বিদ্যাসাগরের যুক্তি তার নখদর্পণে। ভূদেব ভরসা পায়। দ্বিতীয় দৃশ্যটি কলেজের এক প্রফেসরের সঙ্গে। উমাপ্রসাদ তার খুব প্রিয় ছাত্র। এখানে উমাপ্রসাদ তার সমস্যায় সংশয়াচ্ছন্ন। নীতিবাগীশ কাটখোট্টা প্রফেসরের ভেতরে যে একটি স্নেহপ্রবণ দরদী মন আছে সেটা কথায় কথায় প্রকাশ পায়। তার ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে। উনিশ বছর বয়সে ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য তাকে সামলাতে হয়েছে পিতৃদেবের প্রবল প্রতিরোধ। সংস্কার-বিরুদ্ধ কাজ করতে যাওয়া মানেই চোট খাওয়া। বিবেক-চেতনা যেটাকে সত্য বলে মেনেছে সেটাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্যই লড়াই করতে হয়। তত্ত্বকথা আওড়ানো আর বাস্তবজীবনে সমস্যার মোকাবিলা করা এক নয়।

এই প্রফেসরের চরিত্রায়নে সত্যজিতের চিন্তাভাবনার ছাপ স্পষ্ট। প্রথম দিককার খসড়ায় তিনি তাকে stoic চরিত্র হিসেবে ভেবেছিলেন। উমাপ্রসাদের সঙ্গে তার কথোপকথনে শুনি:

উমা : আমার confused লাগছে— তাই এলাম যদি আপনাদের কাছে কোন রকম—

প্রফেসর : দেখ উমাপ্রসাদ— এই হচ্ছে আমার বাবার ছবি— আর at the age of nineteen আমি ধর্ম পরিবর্তন করি, তাতে ইনি যে খুব খুশি হননি সেটা বুঝতেই পার— সেই সময় থেকেই আমার জীবনটা যে খুব নির্বিঘ্নে কেটেছে তা বলতে পারব না। অবিশ্যি আমি তোমাকে আমার বিঘ্নের ফিরিস্তি দিতে চাই না— কিন্তু একটা অবস্থায় এসে দেখলাম যে বিঘ্নগুলো আর খুব বিরক্ত করছে না— stoics-দের কথা শুনেছ ত? তারা বলে যে... আমিও কতকটা সেই রকম হয়ে গিয়েছি। আত্মীয় স্বজনের দুঃখকষ্টে চোখের জল ফেলা— এ যে কতদিন বন্ধ হয়ে গেছে মনেই নেই— অথচ ওথেলোর মৃত্যুদৃশ্য যতবারই পড়ি চোখের জল ত রাখতে পারি না।

সত্যজিৎ রায় পরে এর পরিবর্তন করেন। উমাপ্রসাদ সম্পর্কে তার প্রফেসরের মনোভাবে যে উৎকণ্ঠার প্রকাশ পায়, সেটা ঠিক stoic চরিত্রের পর্যায়ে পড়ে না।

এক জায়গায় দেখি সত্যজিৎ রায় এদের দুজনের কথোপকথনে ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারের প্রসঙ্গ আনেন। উমাপ্রসাদ ছাত্র হিসেবে যে খুব মেধাবী ও মনোযাগী, তাই প্রফেসরের স্নেহ-ভালোবাসা কেড়েছে সেটা বোঝাতে গিয়ে চিত্রনাট্যের এক খসড়ায় লেখেন:

—Test এর খাতা দেখছি, তা তোমারটা নেই, তাই তোমার কথাটা বেশি করে মনে হচ্ছিল— বোসো বোসো— আমিও বসছি।

—আমি ছিলাম না স্যার।

—জানি, তোমার অনুসন্ধানে লোক এসেছিল কলেজে।

—ও (Question paper হাতে নিয়ে দেখে)।

—এই scansion টা। ওটা অনেককেই বিব্রত করেছে, অবিশ্যি তোমার বোধহয় অসুবিধা হবে না।

—Anapaestic।

—Exactly।

ছবি থেকে এই প্রসঙ্গও বাদ পড়ে। মনে হয়, বিষয়টা এই ছবির পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো একটু esoteric হয়ে পড়ত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গল্পের প্লটটি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পান। গল্পটি প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকায়, ভাদ্র ১৩০৬ সংখ্যায়। গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হয়েছিলেন। দেবীর সাইকোলজি পরিস্ফুট হয়নি বলে। সত্যজিৎ রায় গল্পের কাহিনি বিন্যাসের সরলমাত্রিক কাঠামোকে পালটে ছবিতে ঘটনার অন্তরালে মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্য, আমাদের মনে হতে পারে ছবিটির দৃশ্যবিন্যাস 'সাইকিক পার্সস্পেকটিভে' রচিত। প্রধান মনস্তাত্ত্বিক ভাবগুলিই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি।

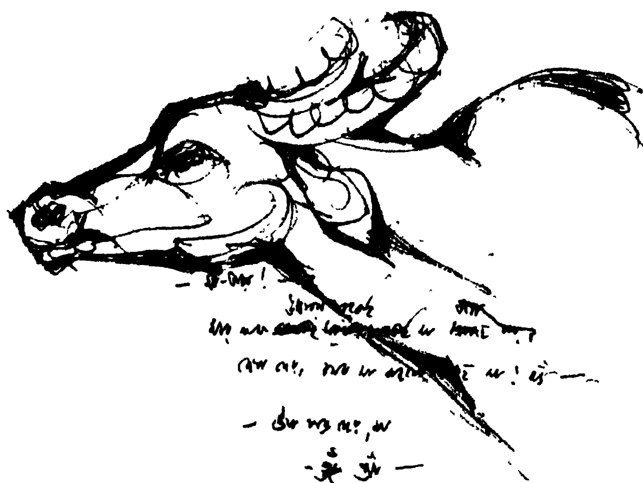
কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশের পর ছবিতে ঘটনার স্রোত একের পর পর যেভাবে ঘটতে থাকে তাতে আমাদের মনে হয় সত্যজিৎ রায় যেন গ্রিক নাটকের অনুসরণে অনিবার্য ভবিতব্যের দিকে পরিণতিকে টেনে নিয়ে যান। ছবির শেষ দৃশ্য গল্পের অনুসরণে তৈরি হয়নি। গল্পে, দয়াময়ী আত্মহত্যা করে। ছবির পরিণতি দৃশ্যগতভাবে অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়, বক্তব্যের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রভাতকুমারের গল্পের মূল ভাবকে রেখে ছবির জন্য সত্যজিৎ রায়কে প্রায় সব ক'টি দৃশ্যই নতুন করে সাজাতে হয়েছে। খেরোর খাতায় তাঁর কাটাকুটির পরিমাণ দেখে বোঝা যায় যে এর মধ্যে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে চারটি দৃশ্য। ভূদেবের সমস্যা নিয়ে উমাপ্রসাদের পরামর্শ, উমাপ্রসাদের সঙ্গে তার প্রফেসরের কথোপকথন, কালীকিঙ্করের সঙ্গে উমাপ্রসাদের মুখোমুখি দুটি দৃশ্য। পাতার পর পাতা জুড়ে এই দৃশ্যগুলির কাটাকুটির পরিমাণ অসংখ্য।

ছবি তৈরির জগতে সত্যজিৎ যখন বিশ্ববন্দিত, ছবির মাধ্যমকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত, তখনও তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এই কাটাকুটির পরিমাণ আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের ভাবিয়ে তোলে যে এই প্রতিভাবান মানুষটির কাছে

বাইরের সর্ববিধ পুরস্কার, তারিফ কিছুতেই তাঁর অনুসন্ধানের আগ্রহকে, নিজের সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার তাগিদকে চাপা দিতে পারছে না। কাটাকুটি তো হল ছিন্নভিন্ন করে দেখা, মনের অতৃপ্তি, নিজের উপর সংশয়ের প্রকাশ। কেন এই অসন্তোষ, কেন এই অনাস্থা? মনের মধ্যে এই ভাঙচুর, মাধ্যমকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা কি তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদে?

প্রতিষ্ঠা, করতালিধ্বনি, পুরস্কার আমাদের এক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ করে রাখতে চায়। এই তো সব পেয়ে গেছি, আমার কাম্য বস্তু। কিন্তু প্রতিভাবানদের সত্যিকারের কাম্য কী? প্রতিষ্ঠা-হাততালি-পুরস্কার? তাঁরা চান নিজেদের প্রকাশ করতে, যেভাবে প্রকাশ ঘটে প্রকৃতির মধ্যে— প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। ভোরবেলায় সূর্যের যে প্রকাশ, অঙ্কুর থেকে গাছের যে প্রকাশ, ফুলের মধ্যে সৌরভের যে প্রকাশ, সেই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে বলেই নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের প্রকাশক্ষমতার বোঝাপড়া চলে অবিরত। একটা যুদ্ধে জিতে যেন আর একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। শিল্পক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তির মুহূর্ত আসার নয়! সেখানে শুধু লড়াই আর লড়াই। এ লড়াই শেষ মানে না। তার পরিচয়েই ভরে আছে সত্যজিৎ রায়ের খেরোর খাতা।



১। [illegible] ? —
[illegible] impression [illegible] ? [illegible] ?
[illegible] ? [illegible] ? [illegible] ?

২। [illegible] কালীপুজো [illegible] ?

৩। [illegible] কালীপুজো [illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ? [illegible] ?

৪। [illegible] ? [illegible] ? কালীপুজোর মন্ত্র কী ?

৫। [illegible] ? [illegible] ?

৬। [illegible] ? কালীপুজোর [illegible] ? [illegible]

৭। [illegible] ? [illegible] ? [illegible] ? [illegible] ? [illegible]
[illegible] ? [illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?

৮। ~~[illegible]~~ [illegible] ? [illegible]
details

খেরোর খাতা। দেবী ছবির চিত্রনাট্যের জন্য অনুসন্ধানের বিষয়-তালিকা



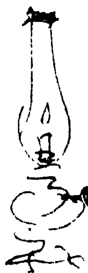
1880's

1864

1880's CTC

Illustrated London News

Graphic



(fur coat)

খেরোর খাতা। চিত্রনাট্য: দেবী। তত্ত্ব তালাশের নমুনা

খেরোর খাতা। দেবী: চিত্রনাট্যের খসড়ায় কাটাকুটির অংশ

দেবী— ফিরে দেখা

দয়াময়ী ষোড়শবর্ষীয়া ও রূপসী। ধনী জমিদারবাড়ির আদরণীয়া বধূ। সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী তার। টানা দীর্ঘ চোখে ও সুডৌল মুখাবয়বে প্রতিমার আদল। সে লেখাপড়া শেখেনি। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিষেধ। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নাকি বিধবা হয়! ছোটবেলা থেকে সে শিখেছে ঠাকুরদেবতা পুজো করতে, গুরুজনদের ভক্তি করতে, সংসারের যাবতীয় কাজ করতে। বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুড়বাড়িকে নিজের মতো করে নিতে। পতি দেবতা, তার চেয়েও বড়ো দেবতা পতিদেবের পিতা। সনাতন বংশে জন্মাবার ফলে দয়াময়ী সব-কিছু মানিয়ে নেয়, মেনে নেয়। শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, সংসারে যা শেখানো হয়েছে, সেই হল অমোঘ বিধান। এ-সব নিয়ে তর্ক করার কথা ভাবাই যায় না। দয়াময়ী যুক্তি দিয়ে কোনও কিছু বিচার করতে শেখেনি। বিশ্বাস করে সব-কিছু মানিয়ে নেওয়াই পবিত্র কাজ— পুণ্য। অবিশ্বাস করা, তর্ক করা, প্রতিবাদ করা, অমান্য করা পাপ। তাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়, বিপদ আসে। অভিশাপ দেয় ভগবান। অশান্ত মনকে প্রচলিত অনুশাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখতে পারলেই শান্তি। নিজের ও পরিবারের মঙ্গল। কত রকম দুঃখ শোক যন্ত্রণা অনাচার অত্যাচার আছে সংসারে। কত জানা-অজানা বিপদ। এ-বিপদের আতঙ্কে আর আশঙ্কায় ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার, সুখ যেন মরীচিকা। এই আছে, পরমুহূর্তেই শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে— এমনই নিরাপত্তাহীন জীবন। এর থেকে নিস্তারের উপায় কী? ত্রাণকর্তা কে? আছেন। ভগবান। এ বাড়িতে রোজ

আদ্যাশক্তির পুজো হয়। নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক শ্বশুরমশাই নিজের হাতে পুজো করেন। কালীকিঙ্করের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। জমিদারির থেকে আয়ও নিয়মিত। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় কাটান মন্দিরে, মায়ের আরাধনায়, চণ্ডীপাঠে বা আদ্যা-মার কথা ভেবে। মুদ্রাপ্রকরণ, মাতৃকান্যাস যমনিয়মাদি বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। গ্রামের লোকের ধারণা, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ।

কালীকিঙ্করের সাতমহলা বাড়ির পেছনে গ্রাম। দূরে নদী। এই গ্রামীণ পটভূমি, বাড়ির গঠনশৈলীতে খিলান ও স্তম্ভ, আসবাবপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, রাস্তায় পালকির উপস্থিতি এক সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া তৈরি করে। [সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের খসড়া খাতায়, টানা-পাখা, সময়োপযোগী পোশাক-আশাকের নমুনা, টেব্‌ল ল্যাম্পের নকশা, পাল্কিবাহকদের পরিচ্ছদ সম্পর্কে ড্রইং বা মন্তব্য দেখা যায়।]

ছবির শুরুতে মাটির মূর্তি ক্রমে চক্ষুদানে, গর্জনের প্রলেপে, সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রে অলংকৃত হয়ে দেবীপ্রতিমার রূপ নেয়। [দেবীমূর্তি তেরি করার জন্য সত্যজিৎ রায় দায়িত্ব দেন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের। কুমারটুলির ঠাকুরের মূর্তিতে থাকে পুতুল-পুতুল ভাব, এ ছবির জন্য তিনি চেয়েছেন একচালায় ডাকের সাজে সনাতন দেবীমূর্তি] পরে স্তবপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ, কাঁসরঘণ্টা, ঢাকের বাদ্যের শব্দে, ওপরে ঝাড়লণ্ঠন ও নীচে পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আর ধূপধুনোয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পুণ্যার্থী মানুষের মন। কালীকিঙ্কর ও তাঁর অনুগত বড় ছেলে তারাপ্রসাদ করজোড়ে দাঁড়িয়ে দুর্গাপ্রতিমার সামনে, পূজাশেষে ভক্তিভরে নতজানু হয়ে প্রণাম করেন দেবীকে, পুণ্যলাভের আশায়। পরবর্তী দৃশ্যে কালীকিঙ্করের পাশে ছোট ছেলে উমাপ্রসাদ। অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁরাও পশুবলি দেখেন। পুজার ছলনায় এই পশুবলির দৃশ্যে উমাপ্রসাদের চোখেমুখে ভ্রূকুটি ও বিরক্তির ছাপ। পরে সে দয়াময়ীকে পাশে নিয়ে ভাইপোকে কাঁধে চাপিয়ে দেখে অন্ধকার আকাশে আলোর রোশনাই— বাজি পোড়ানো।

উমাপ্রসাদ কলকাতায় কলেজে লেখাপড়া করে, ইংরেজি বই পড়ে। রামমোহন বিদ্যাসাগরের আদর্শে সে অনুপ্রাণিত। শেক্‌সপিয়ারের নাটকের চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। সনাতন যুগের সঙ্গে আধুনিক কালের পার্থক্য তার চোখে ধরা পড়ে। বাড়ির বড় বউমা একটু সন্দেহবাতিক, ভক্তিতে নিষ্ঠা কম। তবে পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজ, পুরুষের প্রাধান্য সর্বত্র, কী সমাজে কী গৃহে। কে তার প্রতিবাদ করবে, তাকে অস্বীকার করবে? [ক্যামেরার দৃষ্টি বাড়ির দেওয়ালে প্রতিহত হয়, খড়মের কেঠো আওয়াজ, বলিষ্ঠ দেহ, ভরাট কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায় বাড়ির কর্তার অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি]

সত্যজিতের *দেবী* ছবির পটভূমি এই রকম। ছবির পটভূমি মূল গল্পের সময়-কাল থেকে অনেকটা এগিয়ে আসা, গল্পটি লেখা হয় বাংলা ১৩০৬ সালে, অর্থাৎ ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে। কাহিনির সময় 'সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।' অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে। গল্পে কালীকিঙ্করের ছোট ছেলে 'উমাপ্রসাদ সংস্কৃত ছাড়িয়া শখ করিয়া পারস্য-ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' সত্যজিতের ছবির ঘটনার সময় হল উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে, যখন দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* পাবলিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ও জানিয়েছেন 'সে বাংলাদেশে একদিকে যেমন ছিল প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামির অজ্ঞতা তেমনি অন্যদিকে দেখা দিচ্ছিল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে নবোন্মীলিত, সংস্কারমুক্ত নব্যযুবক সম্প্রদায়। *দেবী* সেই যুগেরই একটি জমিদারগৃহের কাহিনি যেখানে এই দুই বিপরীতমুখী ধারার সংঘাতে ট্র্যাজিডির উদ্ভব।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *দেবী* গল্পটি ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে, তাঁর গল্পসংগ্রহ *নবকথায়* সংকলিত হয়। *নবকথার* দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৩১৮ সন) তিনি জানান *দেবী* গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন— এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই— এখন করিলাম।' ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ তারিখে প্রভাতকুমার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন 'আমাকে যত শীঘ্র পারেন একটি প্লট পাঠাইয়া দিবেন, ভাদ্রের জন্য সেটি এখন হইতে তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিব।'

সত্যজিৎ রায় এই কাহিনি নিয়ে ছবি করার কথা ঘোষণা করেন ১৯৫৯ সালে। খেরোর খাতা চিত্রনাট্য লেখা শুরু করার তারিখ ১২/৯/৫৯। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে। যদিও তখন বাঙালি সমাজে হিন্দু-ব্রাহ্ম ভেদাভেদ প্রায় নেই বললেই চলে, তবুও ছবিটিকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্কের সূচনা হয়, গোঁড়া হিন্দুসমাজে ছবিটি নানা রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। বিতর্ক এতটাই তুমুল হয়ে উঠেছিল যে সত্যজিৎ রায় বলতে বাধ্য হন 'ধর্মের গোঁড়ামি মানুষের জীবনে কী বিপর্যয় আনতে পারে, সেই কথাই তিনি এই ছবিতে বলতে চেয়েছেন... হিন্দুধর্মকে এতে কোনভাবেই আক্রমণ করা হয়নি।'

*

বড় সুখের দিন ছিল দয়াময়ীর। রূপবান বিদ্বান স্বামী। তার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী। পরম পণ্ডিত, ধার্মিক, ধনী, সম্মানীয় শ্বশুর। সচ্ছল সংসার, স্নেহ মমতায় পালিত কোলজোড়া ভাসুরপো। আর কী চাই, এই সরল নিরিবিলি প্রকৃতির

মেয়েটির। তার শুধু একটাই দুঃখ, তার স্বামী সব সময় তার কাছে থাকে না। পড়াশুনার জন্য তাকে বছরের অনেকটা সময়ই কলকাতায় থাকতে হয়। এ জন্য দয়ময়ীর অভিমান হয়, সদ্যযুবতী দয়া আরও কাছে চায় স্বামীকে, সব সময়। কী হবে এত পড়াশুনা করে? লোকরা তো পড়ে চাকরির জন্য, চাকরি তো রোজগারের জন্য। এ বাড়িতে তো টাকার কোনও অভাব নেই। তবে কেন পড়াশুনা? উমাপ্রসাদ বিদ্বান হতে চায়। বিদ্বান? শ্বশুরমশাই তো কত বিদ্বান। কত শ্লোক জানেন, কত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন। তাঁর সারা দিনই তো কাটে ধর্মগ্রন্থ পড়ে। উমাপ্রসাদ বলে 'সে তো পুরনো বিদ্যে। তাঁর মধ্যে আর আমার মধ্যে এক যুগের ব্যবধান।' এত শক্ত কথা দয়া বুঝতে পারে না। তার জীবন খুব সহজ। মা-ঠাকুরমাকে যেমন দেখেছ। তাঁদের স্বামীরা, এমনকী এ বাড়ির ভাসুরঠাকুরও বউকে ছেড়ে বিদ্যার্জনের জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে যায়নি। তবে তার স্বামী কেন অন্য রকম? দয়ার কষ্ট হয়, অভিমান হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। সে কিছু চাইতে পারে না, তার কোনও দাবি নেই। মেয়েদের কিছু চাইতে হয় না। যেটুকু পাও সেইটুকুই তোমার ভাগ্যে বরাদ্দ ছিল, সেটুকু নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাকো, এই শিক্ষাই সে পেয়েছে ছোটবেলা থেকে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান এ রকমই। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পুরুষশাসিত সমাজে এটাই প্রথা। আর অনড় হিন্দু সমাজে? সে ব্যবস্থায় যা-কিছু সনাতন সেটাই ভালো। সেটাই ঈশ্বরের নির্দেশ। ব্রহ্মসংহিতায় তাই লেখা। ধর্মীয় অনুশাসনে গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনই সাধারণ মানুষের মানসিক শান্তির উপায়। অত্যাচার হোক— মাঠঘাটে হাটে— ধনরত্ন নিয়ে— ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। কেউ অত্যাচারীকে মেনে নেওয়ার জন্য জন্মেছে, কেউ অত্যাচার করার জন্য। এ না হলে সমাজে ভারসাম্য থাকে না।

উমাপ্রসাদ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে স্বনির্ভরতায় বাইরে চাকরি নেওয়ার কথা ভাবে, যৌথ পরিবার ছেড়ে আলাদা সংসার পাততে চায়। একদিন দয়ার কাছে জেনে নেয়, সে পড়াশুনা শেষ করে যখন চাকরি করবে তখন বাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে বাইরে যাবে কি না? দয়া মুখে বলে, যাব। কিন্তু তার তো দুটো বড়সড় রকমের পিছুটান। এক, শ্বশুরমশাই। 'বাবা যদি যেতে না দেন। ওঁর যে আবার আমাকে ছাড়া একদম চলে না।' বড় বাধ্য এই ছোট বউ। ঘর যেন আলো করে রেখেছে। পাঁচ বছর আগে উমার মা মারা গেলে কালীকিঙ্করের সংসারে মন টিকছিল না। ভেবেছিলেন বড় ছেলে তারাপ্রসাদের হাতে জমিদারির ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। বাদ সাধল এই ছোট বউ। দয়া বউ হয়ে এ সংসারে আসার পর আবার যেন সব পূর্ণ হয়ে উঠল। বুড়ো বয়সে কালীকিঙ্কর আদ্যা-মার

কৃপায় নতুন করে মা পেলেন। তাকে পুজোর সব আয়োজনের ভার দিয়েছেন, দয়ার কষ্ট হলেও। সেটা তার 'বুড়ো ছেলের আবদার।' দয়ার এতে ভালোই লাগে। এ ছাড়া, দয়া নিজেও ভাসুরপো খোকাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। উমাকে প্রশ্ন করে, 'খোকাকে ছেড়ে যাব?' খোকাও কাকিমার এত ন্যাওটা যে তার মায়ের হাতে খাবে না, নাইবে না, কিছুই করবে না। বড়ো জা দয়াকে বলে 'কী জাদু করেছ তা তুমিই জানো।' দয়া স্নেহের বাঁধনে খোকাকে, পরিবারের সকলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ঘনিষ্ঠ অনুরাগের মুহূর্তে উমা ইঙ্গিত দেয় 'খোকা একটাই হয় নাকি।' মাতৃত্বের স্বাদ দয়াকে আচ্ছন্ন করে, যৌবনের টান তাকে লজ্জিত করে। রক্তমাংসের নিটোল মেয়ে তো সে।

দাস-দাসীতে ভরা সংসারে বাড়ির বউদের কাজ আর কতটুকু? এ বাড়ির সারা দিনের প্রধান কাজ হল দেবসেবা। শুধু এই পরিবারকে নয়, সারা গ্রামের, এমনকী দূরদেশের লোকদের রক্ষা করছেন আদ্যা-মা। একে মন্দিরে পুজোর বিশাল আয়োজন, তার উপর দর্শনার্থীর ভিড়ও কম না। ছোট বউ নিপুণভাবে মন্দিরের কাজ করে, কালীকিঙ্কর মুগ্ধ হয়ে দেখেন, ভাবেন, কী সৌভাগ্যবান তিনি। শুধু কি ঠাকুর দেবতা, শ্বশুরের সেবায়ও দয়া যত্নবান। অপরাধী চিত্তে কালীকিঙ্কর ভাবেন, বউমাকে তো কাজের পর কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন, তার যত্ন ঠিক হচ্ছে তো। তার কষ্ট লাঘবের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উমা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, 'সে তোমার কদর বোঝে তো মা?' কালীকিঙ্করের ভয় তো শুধু উমাকে নিয়ে। খ্রিস্টান হওয়ার যুগে তিনি 'আজকালকার ছেলেদের মতি গতি বুঝতে পারেন না।'

দয়ার এ-সব কাজে মোটেই কষ্ট হয় না। শ্বশুরমশাইয়ের এত স্নেহ, এত নির্ভরতা। অন্য দিকে, খোকার কাকিমার কাছে যত আবদার, রোজ ঘুমোবার আগে কাকিমা গল্প বলে। গল্প শোনার জন্য রাতে খোকা চুপিচুপি বালিশ মাথায় নিয়ে ঠিক কাকিমার ঘরে চলে আসে। দয়ার এতে ভালো লাগে। এত বড় খাটে একা-একা শুয়ে থাকার চাইতে খোকা এলে তাকে আদর করে মনের নিঃসঙ্গতা একটু কমানো যায়। বাড়ির সবার ভালোবাসা, এমনকী পোষা চন্দনা পাখিটার আবদার তাকে ভরিয়ে রাখলেও একটি যুবতী রমণীর অভাব এতে পূর্ণ হওয়ার নয়। সে অনুভব করে, মুখ বুজে সহ্য করে।

*

ভক্তির মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে অন্ধত্বে পর্যবসিত হয়, তখন আসে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের জাল বড়ই বিস্তীর্ণ। স্বাভাবিক জীবনকে পর্যুদস্ত করে

দেয় অনায়াসে। মানুষে মানুষে সম্পর্ককে কোথা থেকে নানান কাঁটাজালে ঘিরে ফেলে। যুক্তিবিরোধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কালীকিঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন, দয়াময়ী আদ্যাশক্তির মানবীরূপ নিয়ে এসেছে তাঁর সংসারে। এ তাঁর পুণ্যের জোর, ভক্তির জোর, প্রার্থনার জোর। যে মায়ের কাছে তিনি সারাজীবন ধরে কৃপালাভের দাক্ষিণ্য চেয়েছেন, সে আশা মা পূর্ণ করেছেন। কালীকিঙ্করের তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যে বিহ্বল হতভম্ব দয়াময়ীর পায়ের আঙুল কুঁকড়ে যায়, অসহায় হাত শূন্য দেয়ালে অবলম্বন খোঁজে। কিন্তু কালীকিঙ্করের যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস থেকে এল আত্মম্ভরিতা। তিনি মানবসমাজ থেকে যুবতী মেয়েটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেবীত্ব আরোপ করলেন। তার স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন শেষ করে দিতে চাইলেন। সে তার শোওয়ার ঘর থেকে নির্বাসিত। বাড়ির লোকজন তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। খোকার কচি মনেও ধরা পড়ে, পরিবর্তিত অবস্থার খেইহারা ছবি।

কেন? কালীকিঙ্কর তো দয়াকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। এ নিশ্চয়ই তার ক্ষতিসাধনের জন্য নয়। তবুও তার শারীরিক-মানসিক দুই দিকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই অমানবিক কাজ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করলেন না? আমাদের মনে হয়েছিল তাঁর চরিত্রে নিষ্ঠুরতা নেই, প্রতিহিংসা নেই, তিনি প্রকৃত অর্থে নিষ্ঠাবান, তবুও এই অন্যায় তিনি করলেন কেন? এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগতে পারে। কালীকিঙ্কর সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জমিদার হিসেবে সফল, বৈষয়িক বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ। কালীকিঙ্কর ভণ্ড নন এবং আপাতদৃষ্টিতে স্নেহপরায়ণ, পরোপকারী ও প্রজাবৎসল, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ও সংযত পুরুষ। কিন্তু তিনি ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যুক্তিবিরোধী, পরমত-অসহিষ্ণু। তিনি দাম্ভিক— নিজে যা বোঝেন সেটাই ঠিক। চরিত্রে বা মনোভাবে যা নেই তা হল ধর্মান্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার শিক্ষা, সংস্কারকে যুক্তি দিয়ে বিচার করা, অন্ধ বিশ্বাস থেকে মোহমুক্ত হয়ে তার সত্যাসত্য নিরূপণ করে বিশ্বাসে পৌঁছনো। উমাপ্রসাদের ভাষায় 'তার বিদ্যা বিদ্যা নয়, পুরানো বস্তাপচা সংস্কার মাত্র।'

দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনে আমাদের চরিত্রের কালিমালিপ্ত দিকটা অনেক সময় নজরে পড়ে না। সমস্যা ঘনিয়ে এলে চারিত্রিক বিচ্যুতিগুলি নজরে আসে। একটি সাধারণ অসহায় যুবতী রমণীকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যে তার মনের উপর কতটা অমানবিক দৌরাত্ম্য, তার পরিণাম দেখে আমরা শিউরে উঠি। এই দুর্বল প্রতিরোধহীন বধূকে দেবীর অবতার বানিয়ে তার অস্তিত্ব ও মানসিকতায় তিনি যে বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করলেন, কালীকিঙ্কর সে সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন। বরং

অহংকারে আত্মমগ্ন হয়ে নিজের গৌরব জাহির করলেন পুণ্য ও তাঁর সাধনার দোহাই দিয়ে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কালীকিঙ্করের ধর্মচারণ কি কোনও ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে উৎসারিত? না কি তা কেবল আত্মকেন্দ্রিক মানুষটির নিজের গৌরব বা স্বার্থরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে দাক্ষিণ্যলাভের প্রার্থনা। না কি 'খ্রিস্টান স্বামী' উমাপ্রসাদের কাছে থেকে সরিয়ে এনে নিজের কাছে রাখার উপায়, বা কোনও জটিল কামনাময় ভাবনার পাপবোধকে চাপা দেওয়ার জন্য এই দেবীত্বের আরোপ? [স্বপ্ন দেখার রাত্রের আগের দৃশ্যে শ্বশুরের খোঁড়া পায়ে তেল মালিশ করছে, উমাপ্রসাদ প্রসঙ্গে কথায় কথায় চিঠি 'রোজ লেখে?' প্রশ্নে কালীকিঙ্করের কৌতূহলী মন যেন স্নেহের মাত্রা অতিক্রম করে যায়।]

দেবী কাহিনীটি আমাদের সমাজে অসহায়, প্রতিরোধে অক্ষম নারীদের উপর মানসিক নির্যাতন ও পেষণের একটি করুণ উপমা। সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজে এই উৎপীড়ন চলে নানাভাবে— কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতিনীতির আড়ালে। দয়াময়ীর আরোপিত দেবীত্বে আসীন হবার পরবর্তী ঘটনা গ্রিক ট্র্যাজেডির রূপ নেয়। অনিবার্য ভবিতব্য যেন নির্ধারিত পরিণতির দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়— দুটি তাজা প্রাণকে নিঃশেষ করে।

প্রভাতকুমারের গল্পে উমাপ্রসাদ বাবার বিশ্বাসকে ভুল প্রতিপন্ন করার জন্য সামনাসামনি তাঁর আচরণের নিন্দা করে না। যদিও সে বোঝে বাবা ভুল পথে চালিত, এটা ঘোরতর অন্যায়। গল্পে, উমা এই পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য দয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। সত্যজিৎ তাঁর উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে দেখান যুক্তি ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব। দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার করছে। হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকরা সামাজিক ও ধর্মীয় কু-প্রথা দূর করার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট। তবে অনড় সমাজে যুক্তির প্রভাব আনার চেষ্টা চললেও সর্বত্র তা প্রসারিত নয়। উমা জানে যে সমাজের এই অনড় শক্ত ভিতটাকে নাড়া দেবার, ভেঙে ফেলার ক্ষমতা তার একার নেই। উমাপ্রসাদের প্রথমবার নদীপথ দিয়ে বাড়ি আসার দৃশ্যে লং শটে তার প্রতিরূপ যেন স্থবির সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘাতের পক্ষে নিতান্ত ক্ষীণশক্তি। সনাতন বিশ্বাসকে সরিয়ে ফেলার বিষয়ে সংশয়ভাব না থাকলেও আবাল্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লালিত উমাপ্রসাদ অন্যায়ের প্রতিরোধে বাবার বিরুদ্ধাচরণে দ্বিধাগ্রস্ত। উমা যদি প্রথমবারই তার স্ত্রীকে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারত তা হলে হয়তো দয়াময়ীকে বাঁচানো সম্ভব হত।

মন্দিরে তখন নিবারণ মণ্ডল তার রুগ্‌ণ নাতিকে কোলে করে নিয়ে এসেছে জীবন্ত আদ্যা-মায়ের দয়াভিক্ষার জন্য। কালীকিঙ্কর তাকে আশ্বাস দেন 'চিন্তা কোরো না নিবারণ, মায়ের চরণামৃতের চেয়ে বড় ওষুধ আর নেই।' রুগ্‌ণ ছেলেটিকে চরণামৃত পান করানো হয়। এ দিকে ঘরের ভিতর শুরু হয় উমাপ্রসাদ ও কালীকিঙ্করের মধ্যে যুক্তি ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব। পরপর দৃশ্যে দেখি কালীকিঙ্করের ধর্মান্ধ ভাব, উমাপ্রসাদের অসহায় মূর্তি। শুনি কালীকিঙ্করের দৃপ্তকণ্ঠে রঘুবংশম্ থেকে আবৃত্তি, এমনই সময় মন্দির থেকে ভেসে আসে সোল্লাসে দেবীর জয়ধ্বনি— রুগ্‌ণ মৃতপ্রায় বালকটির জ্ঞান ফিরেছে। বিজয়ীর ভঙ্গিতে কালীকিঙ্কর বলে ওঠেন 'আর প্রমাণ চাও! মরা ছেলে বেঁচে ওঠে, এ দয়াময়ীর কৃপা না হলে সম্ভব? উমা, যাও, তাকে প্রণাম করো গিয়ে— বলো, জয় মা দয়াময়ীর জয়'। [এই দৃশ্যগুলিতে নাটকীয় ঘনত্ব এসেছে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে ও দৃশ্য-পরম্পরাকে নিপুণভাবে সঠিক সময়ের পরিমাপে সাজিয়ে তোলার জন্য।]

যে ভাবে ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটে যায় তাতে উমাপ্রসাদের প্রতিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। সে ফিরে আসে শূন্য শোওয়ার ঘরে। পড়ন্ত বেলার আবছা আলোয় সে খাটে বসে ভাবে। মন্দির থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘণ্টার শব্দ তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। এই জীবনহীন পরিবেশ থেকে সে চলে আসে নদীপ্রান্তরে। মুখোমুখি হয় চলমান জীবনের। দিনশেষে জেলেরা জাল কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নদীর বুকে ভাসমান নৌকায় আলো জ্বলে ওঠে, সে বুঝতে পারে বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে দয়াকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হ'ল এই শৃঙ্খলিত বদ্ধ জীবন থেকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া। সে দয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। উমাপ্রসাদ ফিরে আসে দয়ার কাছে, দীর্ঘ চুম্বনে জানিয়ে দেয় সে দেবী নয়, রক্তমাংসের নারী, তার স্ত্রী। তারা চলে আসে ঘর ছেড়ে, ঘাটে। নদীতীরে বিসর্জিত প্রতিমার কাঠামো দেখে ও রুগ্‌ণ বালকের চরণামৃত পান করে বেঁচে ওঠার কথা ভেবে আজন্মকাল সংস্কারে শাসিত নারীমন স্বামী ও সংসারের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। দয়া বলে ওঠে, 'আমি যদি দেবী হই।' বিহ্বল উমাপ্রসাদ ঘটনাচক্রে মনের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সংস্কারের ঘোর সে হয়তো পুরোটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দয়াময়ীর মনের সংস্কারজনিত সংশয় ও কান্না দেখে সে মত পাল্টায়। দয়াকে বলে, 'কেঁদো না, চলো। চলো তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে আসি।' এবার কলকাতায় ফিরে সে দেখা করে তার প্রফেসরের সঙ্গে। প্রফেসরের সঙ্গে কথোপকথনে তার জীবনের বিদ্রোহের কথা শুনে, সংগ্রামের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনে [উমার সঙ্গে প্রফেসরের আলোচনার সময় প্রেক্ষাপটে লৌহ শকটের ধাতব আওয়াজ যেন যুগপরিবর্তনের আভাস আনে।] সে

দ্বিতীয়বার যখন ঘরে ফিরে আসে ততক্ষণে প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, দ্বিতীয়টি ঘটতে চলেছে। [খোকার মৃত্যুদৃশ্যে পর্দা জুড়ে অন্ধকার নেমে আসে, পরের দৃশ্যে আসে জল। চাপা শোক যেন দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই জলের টানে আসে উমাপ্রসাদ। নৌকাঘাট থেকে বাড়ি আসার পথ ও পরিবেশে বিষণ্ণতার ভাব স্পষ্ট] কালীকিঙ্করের সঙ্গে উমাপ্রসাদের দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হবার দৃশ্যে ক্যামেরার নিচু দৃষ্টিকোণ উমাপ্রসাদকে দেখায় অনেক দৃপ্ত ও আত্মসংহত। সে বাবাকে সরাসরি প্রতিবাদ জানায়, বলে আপনি ওকে (খোকাকে) হত্যা করেছেন। নাতির মৃত্যুতে বিপর্যস্ত কালীকিঙ্কর ছেলের মুখে এ কথা শুনে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ক্যামেরা তাঁর শারীরিক টলটলায়মান অবস্থাকে মূর্ত করে দৃশ্যটিকে শেষ করে তাঁর মুখের ক্লোজ-আপে। কালীকিঙ্করের সকল দম্ভ ভূলুণ্ঠিত, তাঁর মুখ পরাজয়ের গ্লানিতে যন্ত্রণাবিদ্ধ।

দয়াময়ীর অপরিণত মনে খোকার মৃত্যুর মতো বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা তার সকল অস্তিত্বকে তছনছ করে দেয়। সে দেবী কি দেবী না— এই সংশয়ের আবর্তে তার তরুণ মন ভারসাম্য হারায়। তার প্রিয় খোকাকে বাঁচাতে না পারার অক্ষমতা তাকে পাপবোধে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। দয়াময়ী খোকাকে রাক্ষুসির গল্প বলত, যে রাক্ষুসি ছোট ছোট ছেলেদের কচি কচি মাংস চিবিয়ে খায়। খোকার মৃত্যুর পর বড় জা অভিযোগ করে 'রাক্ষুসি আমার ছেলেটাকে খেয়ে নিল গো।' তা হলে সে কি রাক্ষুসি? পুণ্যবতী দয়ার মনে পাপের ছোঁয়া লাগে। খোকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সেও অনিশ্চিত। অস্তিত্বের সংকটে দিশেহারা দয়াময়ী পালাতে চায় এই জীবনহীন শৃঙ্খলিত পরিবেশ থেকে, মর্মান্তিক ঘটনাস্থল থেকে, আরোপিত অস্তিত্বের খোলস থেকে। বেরিয়ে যেতে চায় প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে। দয়াময়ী একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। স্বামী যেন তার অচেনা পূর্বজীবনের বন্ধনসূত্র। স্বামীর সান্নিধ্যে আসার অবস্থাটুকুও তার নেই, আর সে স্বামীর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ততার আশ্রয় বোধ করে না। চারিদিক থেকে দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় ভাবে, সে দেবী না কি রাক্ষুসি। অপ্রকৃতিস্থের মতো বলে 'এরা আমাকে মেরে ফেলবে— খোকা।' কথা শেষ হয় না। নদীর ঘাটে সে দেখে জলে গলে যাওয়া প্রতিমার কাঠামো। পুজো করা দেবীমূর্তির অন্তিম রূপ। নদীর পারে খোলা প্রকৃতির মধ্যে শেষ নিশ্বাস ফেলে। একটি তাজা প্রাণ বিপন্ন অবস্থায় অকালে শেষ হয়ে যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিধান ও যুক্তিহীন সামাজিক ব্যবস্থা একটি অপাপবিদ্ধ জীবনের বলির কারণ হয়ে ওঠে। যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের জবরদস্তি প্রয়োগের নিষ্ঠুর পরিণাম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে একটি বিশেষ পারিবারিক ঘটনার সর্বজনীন সামাজিক স্তরে উত্তরণের মধ্যে।

* * *

এ ছবির চিত্রভাষা অত্যন্ত সংহত ও জোরালো। ঘটনার অভিঘাতে বিরোধ ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে। এই বিরোধ আসে নানা স্তরে, পর্যায়ক্রমে। একই পরিবারের মানুষজনের বিপরীতধর্মী মনোভাবের থেকে আসে বিরোধ, উমাপ্রসাদের যুক্তিবাদী মনের সঙ্গে যুক্ত হয় হরসুন্দরীর সন্দিগ্ধ মন। প্রফেসরের জীবনের সংগ্রাম, বন্ধু ভূদেবের জীবনে চলতি স্রোতের বিপরীতে চলার জন্য সংকট ছবির মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

ছবিতে স্পেস ও সময়কে ব্যবহার করা হয়েছে শৈল্পিক নিপুণতায়। ক্যামেরার চলমান গতি প্রাসাদের থামে, দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে শুধু পিঞ্জরাবদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে না, প্রাণহীন শক্ত ভিতের মধ্যে দুর্বল মানুষের অস্তিত্বের অসহায় সংকটকেও মূর্ত করে। ক্যামেরার ধীর গতি যেন মন্থর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অনড় সমাজব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সনাতন রূপটিকে ধরে রাখতে চায়। বিরোধের মুহূর্তে এসে ক্যামেরার চঞ্চল গতি এই স্থাবর বিধিব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে চায়।

এ ছবিতে নদী আসে সংকেতময় ভাবে। জমিদারের প্রাসাদের অদূরেই নদী। এই নদীপথ যেন আধুনিক জীবনের যোগসূত্র। এই নদীতেই প্রতিমার বিসর্জন হয়। উমাপ্রসাদ নদীতীরে গিয়ে তার প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজে। নদী যেন প্রবহমান জীবনের প্রতীক। নদীর বুক চিরেই মানুষের জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে রচিত গান ভেসে আসে।

এ ছবিতে বালক খোকার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুসংস্কারের শিকার হয় দুটি প্রাণী, একটি শিশু, অন্যটি অসহায় নারী। দু'জনেই প্রতিরোধক্ষমতাহীন। খোকার চোখেই পারিপার্শ্বিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি হঠাৎ দেবী হয়ে যাওয়ার পর সবাই মিলে তাকে গলায় মালা পরিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে ধূপধুনোর অপার্থিব পরিবেশে আড়াল করে রেখে তার রক্তমাংসের কাকিমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই কাকিমার ধার ঘেঁষতে সে ভয় পায়। সে অবাক চোখে তাকে দেখে দূর থেকে। অথচ এক সময় এই কাকিমাকে ছাড়া তার এক দণ্ডও চলত না। এই খোকার জীবনের সঙ্গে তার কাকিমার জীবনও জড়িয়ে যায় ঘটনার দুর্বিপাকে। খোকার মৃত্যুই কাকিমার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

*

এই কাহিনি ধর্মের ওপর আঘাত হানে না। ধর্মবিশ্বাস ধর্মবোধ সম্পর্কে কোনও বিরূপ উচ্চারণ নেই। আছে ধর্মান্ধ কুসংস্কারের প্রতি। হিন্দুধর্ম ক্রমে আচার-অনুষ্ঠান

ও সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মানুষে ভেদ সৃষ্টি করল, জাতপাতের দোহাই দিয়ে সমাজে ঢুকে পড়ল অস্পৃশ্যতার কলুষ, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মানুষকে হীন করে রাখার ভ্রষ্টাচার। সকল প্রকার যুক্তিতর্ককে অগ্রাহ্য করে এল অন্ধ বিশ্বাস। অথচ হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থ উপনিষদের মন্ত্র হল প্রশ্ন-বিচার-বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য স্থির করা ও বিশ্বাসে উপনীত হওয়া!

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু
ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম ও সত্যদর্শনে কোন ভেদ নেই।

এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়েই উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার দুজনেই তাঁদের জীবনে ধর্মীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ধর্ম পরিবর্তনে উপেন্দ্রকিশোরকে নানা বাধার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সত্যজিতের জীবনে ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে আসেনি। ছোটবেলায় মার সঙ্গে নানা উৎসবে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনার আসরে গেলেও ধর্মের বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ ও মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর শেষ ছবি *আগন্তুক*-এ মনোমোহনের মুখে শুনি 'ধর্ম means religion। হিন্দুশাস্ত্রে কিন্তু ধর্ম অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মানে... যে জিনিস মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে আমি তাকে মানি না। Religion এটা করে, আর organised religion তো বটেই। সেই একই কারণে আমি জাত মানি না।' কিন্তু যে পরমেশ্বর অন্ধজনে দেয় আলো, মৃতজনে দেয় প্রাণ—- তাকে অস্বীকার করার উপায় কী?

সত্যজিতের ধিক্কার স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কুসংস্কার ও বুজরুকির প্রতি। [বিজয়া রায় জানিয়েছেন 'কুসংস্কারে একেবারেই বিশ্বাসী নন বলে এই গল্পটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল।'] *মহাপুরুষ* বা *জয় বাবা ফেলুনাথ* ছবিতে সে উচ্চারণ আরও স্পষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার ভূমিকা বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাট দশকে অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। শাস্ত্র-বিরোধী ধর্ম কুসংস্কারের আশ্রয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থে সামাজিক চক্রান্তের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই প্রমাণ দেখি *গণশত্রু* ছবিতে। *দেবী* ছবির চরণামৃত *গণশত্রুর* চরণামৃতের ভূমিকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা *দেবীর* কালীকিঙ্করের মানসিকতা ও *গণশত্রুর* ভার্গব বা নিশীথের মানসিকতার মধ্যে পরিষ্কার একটি বৈপরীত্য স্থাপন করতে পারি। কালীকিঙ্কর ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আত্মম্ভরী মানুষ হয়েও ধর্মাচরণে বা পুজোআচ্চায় নিষ্ঠাবান। যদিও তাঁর ঈশ্বরের সাধনা পরিবার, সংসার, প্রকৃতি ও সমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখে। অন্য দিকে ভার্গব ও নিশীথ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চক্রান্তে লিপ্ত। এদের কোনও মতেই ধার্মিক বা ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান বলা চলে না। এরা

সাধারণ নিরাপত্তাহীন অসহায় মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের জাল বিছিয়ে শোষণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এরাই *মহাপুরুষ*-এর বিরিঞ্চিবাবা বা *জয় বাবা ফেলুনাথ*-এর মছলীবাবাদের লালন-পালন করে। ঐতিহাসিক পরম্পরায় আমরা বুঝতে পারি যে সমাজে ভার্গব ও নিশীথেরা কালীকিঙ্করেরই উত্তরাধিকার। শুধুই নিষ্ঠাবান ধার্মিক হওয়া মূল্যহীন— যদি না সে মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি হলে সে ঈশ্বর হয় সর্বনেশে, ঈশ্বরসাধনা হয় নেশাগ্রস্তের মতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সততার প্রকৃত অর্থ হল সত্যকে জানা।

এই সামাজিক ব্যাধির লক্ষণ আজও আমাদের মধ্যে এত প্রকট বলে *দেবী* ছবির প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু ম্লান হয়নি।

নগেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

১৭।৭।৩০



খেরোর খাতা। প্রতিকৃতি: নগেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ।
দেবী ছবিতে পুরোহিতের ভূমিকায়



খেরোর খাতা। দেবী: ভূদেব শঙ্করের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিতের খুদে জগৎ

অপু-দুর্গার নিশ্চিন্দিপুরের জীবন যে নিশ্চিন্ততা আর নির্ভরতায় ঘেরা ছিল, তার লেশমাত্র ছিল না পাঁচ বছরের বালক কাজলের জীবনে। জন্মমুহূর্তে সে তার মাকে হারিয়েছে। বাবা তখন থেকেই ভবঘুরে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কাজল তাকে দেখেনি। তার মনের মধ্যে আঁকা বাবার ছবিতে 'টিকি' দেবে কি না সে জানে না। বাড়িতে দিদিমাও নেই, নেই মামা-মামির হদিশ। বিশাল বাড়িতে শুধু সে আর বৃদ্ধ দাদামশাই।

একটি শিশু তার সব রকম দুরন্তপনার পর, বুড়ি ছোঁয়ার মতো ফিরে ফিরে আসে মার কাছে, তার শরীরের স্পর্শ আর আঁচলের গন্ধ পেতে। সেই স্পর্শ, সেই গন্ধ শিশুর কাছে জীবনীশক্তি, প্রাণরস, পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে আসার অনুভূতি, একান্ত নিজস্ব আশ্রয়। যার সে-মা নেই, কথা শেখার প্রথম শব্দে যে নির্দিষ্ট কাউকে সম্বোধন করতে পারে না, সে শিশু বড় অসহায়। এই অসহায় ভাব সে সচেতনভাবে বোঝে না, প্রাকৃতিক নিয়মে অচেতন মনে এক অপূর্ণতার ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক অন্যদের পূর্ণ করতে হয় গভীর মমত্বে।

বৃদ্ধ দাদামশাই শশীনারায়ণ নিজেকেই সামলাতে পারেন না, শিশুর দুরন্তপনা তাঁর কাছে অসহ্য। 'চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছে আর বদ ফন্দি আঁটছে।' অপুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নিয়তির প্রহারকে শশীনারায়ণ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর খিটখিটে মেজাজের প্রভাব পড়ে কাজলের উপর। দাদু বকবে, দাদু মারবে এই ভয়ে

সে পালিয়ে বেড়ায়। বনে বাদাড়ে ঘুরে শালিক পাখি মারে, রক্তমাখা মুখ চোখের সামনে এনে ভেংচি কাটে, মরা শালিকটাকে সুতোয় বেঁধে ভয় দেখিয়ে তেলেভাজা কেড়ে নেয়, ধরা পড়লে হাত কামড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। দুর্বল মুহূর্তে সে খোঁজে বাবার আশ্রয়, পরিত্রাতার ভূমিকায়।

অপু খুলনায় তার শ্বশুরবাড়িতে এসেই বুঝতে পারে এ বাড়ির এই বিরুদ্ধ পরিবেশ বালকের পক্ষে মোটেই সহনীয় নয়। এখান থেকে কাজলকে সরিয়ে নিতে হবে। হয়তো কাজলের প্রতিক্রিয়া দেখে তার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, ফিরে যায় সে তার নিজের শৈশবে। এই বয়সেই সে পাঠশালায় যেতে শুরু করে। মনে পড়ে, মা-দিদির স্নেহের স্পর্শে সেই সোনালি দিনগুলির কথা। প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যাওয়ার প্রথম দিন দিদি তাকে ঘুম থেকে তুলে, চুল আঁচড়ে, বাটি ভরে দুধ খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে স্কুল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। মনে পড়ে, দিদির সঙ্গে লুকিয়ে তেঁতুলের আচার খাওয়া, কাশবনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে প্রথম ট্রেন দেখা। আর ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় পিসির কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রূপকথার গল্প শোনা। পিসির গলার সেই স্নেহমাখা স্বর, কথার সেই টান, হাতের ইশারা, মুখভঙ্গির ছায়া, চোখের ইঙ্গিত— সব মিলিয়ে এক অনবদ্য সরলতায় তাদের টেনে নিয়ে যেত সীমানা ছাড়িয়ে দূরে। এমন একটি রাজ্য তো কাজলের নাগালের বাইরে। যত দিন কাজলকে সে দেখেনি, তত দিন কাজল তার কাছে ছিল অলীক অবাস্তব অস্তিত্বহীন। তাদের মধ্যে ছিল অপর্ণার মৃত্যুর ব্যবধান। পুলুকে সে বলেছিল 'একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না... কাজল আছে বলে অপর্ণা নেই।' বালকের কাছে এসে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সেই ঘোষিত ব্যবধান। মা-বাবা-দিদির ওপর নির্ভর করে যে-শৈশব সে কাটিয়েছে, তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চায় কাজলের জীবনে। অপু কাজলকে বলে 'কাজল, তুমি আমার সঙ্গে ভাব করবে? আমি খুব ভালো গল্প বলতে পারি। ভূতের গল্প, রাক্ষস-খোক্কোসের গল্প, রাজা, রানি, রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ ঘোড়া— শুনবে? কাজল—।' অপু কাজলের ওপর জবরদস্তি করে না, সে তার নিজের বড় হয়ে ওঠা দিনগুলির কথা মনে করে জানে, জোর করে কোনও কিছুই করা যায় না। তার মা-ও পারেনি। শশীনারায়ণ এ সব বোঝে না। তাঁর কাছে শিশুরা শাসন ও প্রহারের বশ। কাজল অপুর কাছে শুধু এটুকু আশ্বাস চায় যে কলকাতায় গেলে ওর বাবা ওকে বকবে না, ফেলে যাবে না। অপু কাজলকে আশ্বস্ত করে, নিজের পরিচয় দেয় বন্ধু হিসেবে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কে এই বন্ধুত্বের বন্ধন এক সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছে যায়।

আড়াই বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে সত্যজিৎ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন ছোটদের পক্ষে নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার মূল্য কতখানি। তাঁর বাল্যজীবনকে ভরপুর করে রেখেছিল রায়চৌধুরী পরিবারের আশ্চর্য মধুমাখা পরিবেশ। যে বাড়িতে তাঁর জন্ম, সে বাড়িটি আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের কাছে ছিল 'স্বপ্নপুরী'। ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর ও বাবা সুকুমারের জীবদ্দশায় সে বাড়ির পরিবেশ ছিল জমজমাট ও কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলের এক আকর্ষণীয় স্থান। নানা প্রতিভাবান মানুষের যাওয়া-আসা, শিল্প-সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনার পাশাপাশি পরিবারের প্রায় সকলেরই নানান গুণপনার জন্য সর্বদা এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখত। গানে-কবিতায়, গল্প-গুজবে, আড্ডায় যেন খুশির বন্যা বয়ে যেত। ছোটদের সময় কাটত খেলাধুলো, পড়াশোনার সঙ্গে গল্পেসল্পে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বসত গল্প শোনার পালা— দেশবিদেশের গল্প, রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, বড়দের ছোটবেলার গল্প, হাসির গল্প, দুঃখের গল্প ও বিপদের গল্প। এ সব শুনতে শুনতে ছোটদের মন চলে যেত কোন স্বপ্নরাজ্যে।

ব্যবসায়িক বিপর্যয়ে পরিবারে আর্থিক দুর্গতি নেমে আসে এক সময়। গড়পার রোডের বাড়িটি হয়ে যায় হাতবদল। একান্নবর্তী পরিবারের লোকজনরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। সত্যজিতের মা সুপ্রভা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নিয়মানুবর্তী মানুষ। পারিবারিক বিপর্যয় ও সম্ভাব্য বিপদ থেকে বালক মানিককে সব সময়ে আগলে রাখতেন। গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন ভবানীপুরে ভাই প্রশান্তকুমার দাশের বাড়ি। বড় বয়সের স্মৃতিচারণে সত্যজিৎ এই অবস্থান্তর সম্পর্কে লেখেন 'আমার মনে হয় না সে বয়সে বড়বাড়ি থেকে ছোটবাড়ি বা ভালো অবস্থা থেকে সাধারণ অবস্থায় গেলে মনে বিশেষ কষ্ট হয়।' আসলে, কোনও রকম অভাবই বালক মানিককে বুঝতে দেননি সুপ্রভা। তাই সত্যজিৎ বলতেই পারেন 'সন্দেশ পত্রিকা বন্ধ হবার কিছুদিন পরেই যে ইউ রায় অ্যান্ড সনসের ব্যবসাও কেন উঠে গেল, সেটা অত ছেলেবয়সে আমি জানতেই পারি নি।' বাড়িতে কোনও দুর্যোগ বা শোকের পরিস্থিতি এলেই মানিককে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন মা। ছোট বয়সে বালকের মনে যেন কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। ছেলের সমস্ত ভার সুপ্রভা এমনভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন যাতে বাবার অভাবও মানিকের সচেতন মনে কোনও দুঃখবোধের গভীর ক্ষতচিহ্ন না রাখতে পারে। অন্য দিকে, ছেলের সঙ্গে ছেলেমানুষি খেলার মধ্য দিয়ে তিনিও নিজের জীবনের সঙ্গে গভীর বোঝাপড়া করে নিচ্ছিলেন।

গড়পার রোডের বাড়ির সৃজনমুখী পরিবেশ থেকে ভবানীপুরের বাড়ির আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তবে সৃষ্টিশীল জগতের সংস্পর্শ না পেলেও মামাবাড়ির আনন্দময় পরিবেশকে উপভোগ করত বালক মানিক। ভবানীপুরের বাড়িতে যে অভাবটা সে বোধ করত, সেটা হল একজন সমবয়সি বন্ধুর। তা ছাড়া সে বাড়িতে বড়দের থেকে আলাদা করে রাখা হত ছোটদের। এক মজার ঘটনা উল্লেখ করে সত্যজিৎ লিখেছেন 'এমনিতে গম্ভীর মেজাজের লোক হলেও সোনামামার একটা ছেলেমানুষী দিক ছিল। মামার বয়স যখন ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে তখনও রবিবার সকালে তুমুল উৎসাহে খেলা চলেছে ক্যারাম আর লুডো। পরে এল ব্যাগাটেল; তাতেও উৎসাহের কমতি নেই। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আর মাঝে মাঝে শুনতে হত— 'উঁহু, বড়দের মধ্যে থেক না মানিক'। আমি বেরিয়ে আসতাম ঠিকই, কিন্তু এটা মনে হত যে মামারা যে কাজটা করছেন সেটাকে ঠিক বড়দের মানানসই কাজ বলা চলে না।' অন্য দিকে গড়পারের বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটাই ছিল যেন ছোটদের, গল্প কবিতা ছবি দিয়ে পূর্ণ।

তাই অনেকটা সময় সে বাড়িতে একা একাই কাটাতে হত মানিকের। বিশেষ করে দুপুর বেলাটা। সেই নিরালা সময় যাতে সে নিজের মতো করে কাটাতে পারে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল সুপ্রভা দেবীর। মানিকও নিজে নিজেই এক নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল।

রায়চৌধুরী পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও মানিক যাতে সে পরিবারের একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে সেজন্য বই কিনে, কাছে ডেকে গল্প শুনিয়ে বংশগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করার দিকে সচেষ্ট ছিলেন মা সুপ্রভা। এ ছাড়া ধনদাদু কুলদারঞ্জন, ছোটকাকা সুবিমল প্রায়ই আসতেন দেখা করতে। তাঁরা ছিলেন ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। ধনদাদুর মুখে শুনেছিলেন পুরো মহাভারতের গল্প। এক-এক দিন এক-এক পরিচ্ছেদ। ছোটকাকার মুখে শুনতেন ভূতের গল্প। আত্মীয়দের কাছে গল্প শোনা ছোটদের শুধু যে অসম্ভবের রাজত্বে নিয়ে যায়, তা নয়— এতে গল্প-বলিয়ে ও গল্প-শুনিয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক, যার স্থায়ী ছাপ চিরকাল মনের মধ্যে থেকে যায়। স্কুলের ছুটি হলেই মাও তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন নানা জায়গায়— আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, দার্জিলিং, শান্তিনিকেতনের মতো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। শান্তিনিকেতনে পূর্ণিমা রাতে দিগন্ত অবধি ছড়ানো খোয়াইয়ে বসে মা গলা ছেড়ে গান গাইতেন। দার্জিলিং-এ গিয়ে ছোট্ট মানিক মুগ্ধ হয়ে দেখত কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর বিকেলের রোদ গোলাপি থেকে সোনালি, সোনালি থেকে রূপোলি হয়ে আসছে। তবে ছোট মানিকের মনে হত তার মেজোপিসিমার বাড়িতে যত ফুর্তি তেমন

আর কোথাও নেই। সকলে মিলে হইচই করে এখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়া, আর নানা রকম খেলা আর মজা করে দিন কাটানোই ছিলো সে বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। ছোটবেলার এমন নির্ভেজাল আনন্দের স্মৃতি বড় বয়সেও মনে অনেকখানি জায়গা দখল করে ছিল সত্যজিতের। ছোট-বড় এই বাছবিচারহীন পরিবেশে বড় হয়ে সত্যজিতেরও মনে হয়েছিল, কাজলের মনে যে আশ্রয় ও নিরাপত্তার ভরসা দিতে পারে— সে তার জনক না, বন্ধু।

এ ভাবেই বাবার অকালমৃত্যু ও পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সত্যজিতের বাল্যজীবনকে সম্পন্ন করে তুলেছিলেন তাঁর মা ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমাখা সান্নিধ্য। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের জীবনযাত্রার ধরন ও বাড়ির পরিবেশে ছিল শিশুদের কল্পনাশক্তি গড়ে ওঠা ও হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশলাভের আবহাওয়া। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার মানুষ। সে প্রতিভার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়, গানে ছবিতে আর মুদ্রণের কাজে। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল একটাই। কীভাবে তাঁর জীবনের সব শিক্ষাকে ছোটদের কাজে লাগানো যায়। তাঁর সারা জীবনের সমস্ত কাজই যেন ভবিষ্যতের সকল শিশুর প্রতি উৎসর্গ করা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল শিশুই প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাদের চারপাশে আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে আছে অজস্র। এর মধ্য থেকে খুঁজে নিয়ে ওদের সামনে মেলে ধরতে হবে বয়সোচিত পুলক ও পুষ্টির উপকরণ। মন থেকে আনন্দটুকু কেড়ে নিয়ে জোর করে কোনও কিছু করতে গেলে শিশুরা সে কাজে রস খুঁজে পাবে না। জবরদস্তি শিশুমনে চলে না। অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতার পরিবেশে শিশুমন যায় বিগড়িয়ে। এ জন্য কি বাড়িতে শাসন চলে না? থাকবে নিশ্চয়ই। সেটা হল শৃঙ্খলার শাসন, বিশৃঙ্খল অবস্থায় কোনও কিছুই হয় না। সেটাকে আস্তে আস্তে ছোটদের বুঝতে দেওয়া দরকার। বাড়ির পরিবেশ ঠিকমতো তৈরি হলেই শৃঙ্খলাবোধ ভেতর থেকে আপনিই গড়ে ওঠে। সহজ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছোটদের সত্যটাকে চিনিয়ে দিতে পারলেই হল। তার পর তারা আপনাআপনি নিজেদের পথ খুঁজে পাবে।

উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারে শিশুরা নাবালক বলে নগণ্য নয়, বরং জীবনে সহজ সরল শিশুভাবকে বজায় রাখার মতো স্বভাবকে গড়ে তোলার জন্য বড়রাই সচেষ্ট। শিশুবয়স আর বড়বয়স একই জীবনের দুটি অংশ। তবে স্বাভাবিক কারণেই জীবনের শুরু থেকে পরিণত বয়সের দু'-ভাগের সময়ে জগৎকে দেখার দৃষ্টি সমান না। শিশুমনে প্রথা বা সংস্কারের প্রভাব যত দিন না পড়ে, তত দিন সে জগৎকে দেখে সহজ ভাবে, মুক্ত দৃষ্টিতে। শিশুর মুখে কোনও মুখোশ থাকে না, না থাকে মনে কোনও অভিজ্ঞতার আবরণ। তাই সে সত্যকে দেখে, ভাল-মন্দকে বোঝে সরাসরি।

সেখানেই শিশুমনের জোর। বড়দের জীবনের অসঙ্গতি ধরা পড়ে এই শিশুমনের মাপকাঠিতে।

শিশুরা হল প্রকৃতির সৃজন। আর-পাঁচটা প্রাকৃতিক প্রাণের মতো একটি শিশুও জন্মগ্রহণ করে চিরনবীন প্রাণ নিয়ে। এই নবীন চিরত্ব সব দেশে সব কালেই এক রকম। তাই আমাদের *বাইসাইকেল থিভ্‌স*-এর ব্রুনোকে অচেনা লাগে না, লাগে না *কিড* ছবির চ্যাপলিনের বালক-সহচরটির হাবভাব ও ব্যবহার। শিশুমনের চিরসত্য সেখানে লুকিয়ে আছে। একটি শিশু ছোটবেলায় যে দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়াকে দেখে, জীবনের নানা টানাপোড়েনে সেই দেখার চোখকে বয়স্করা হারিয়ে ফেলে। যাঁরা এই দিব্যদৃষ্টিকে বজায় রাখতে পারেন, তাঁরাই শিশুদের মনের কথা বুঝতে পারেন, তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের জটিলতাকে বিচারবোধের মাধ্যমে দূরে সরিয়ে রেখে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে সত্যজিৎ এই কঠিন কাজটি অনায়াসে সম্ভব করতে পেরেছেন বলে তাঁর চোখে শিশুরা শিশুই। তাদের সঙ্গে মেলামেশার সময়, কথাবার্তা বলার সময়, কাজ করার সময় তিনি নিজের ভেতরের শিশুভাবটি বের করে আনেন।

সত্যজিৎ রায়ের অফুরন্ত সৃষ্টি-ভাণ্ডারের মধ্যে প্রধান হল চলচ্চিত্র-রচনা। সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ ছবিতেই ছোট-বড় ভূমিকায় ছড়িয়ে আছে শিশু বা কিশোরেরা। তিনি যখন ছবিতে শিশু বা কিশোরদের ব্যবহার করেন সেখানে তাদের ভূমিকা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানেন শিশুদের মনে কোনও চালাকি নেই, নেই কোনও গোঁজামিল। তারা যেটা দেখে সেটা হল একেবারে খাঁটি জিনিস, তাই তাদের চোখে বড়দের জীবনের ফাঁকটা ধরা পড়বে সহজেই। ছবির সময়ের হিসেবে পর্দায় তাদের উপস্থিতি হয়তো খুব একটা বেশি সময়ের জন্য নয়, তবু তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি ঘটে যাওয়া পরিস্থিতির ওপর একটা নির্দিষ্ট মন্তব্য করে। আবার কোনও কোনও ছবিতে সত্যজিৎ শিশুমনের নিষ্পাপ সরলতাকে পাশ্চাত্য সংগীতের counter point-এর মতো ব্যবহার করে বিষয়ের বা চরিত্রের অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা জটিলতাকে প্রকট করে তোলেন। তাঁর ছবির প্রায় সব ক'টি শিশুচরিত্রই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ।

দৃশ্যশিল্পে ছোটখাটো অভিব্যক্তি, গলার স্বর, বলার ধরন, চোখের চাউনি, মনের ভাবকে প্রকাশ করে। শিশুমনকে সঠিকভাবে না বুঝতে পারলে শিশু-অভিনেতাকে দিয়ে সে কাজটি করিয়ে নেওয়া সম্ভব না। আর একটা কথা হল শিশুদের মুখের ভাষা। ছবির ভাষায় যাকে বলা হয় সংলাপ। সে কথা এমনই হবে যাতে খোকা-

খোকা ভাব করে শিশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে না খাটো করে দেখা হয়— অথবা অতিরিক্ত বাচালতা বা পাকামো জ্যাঠামো করে শিশুভাবটি না হারিয়ে ফেলে। এ সব বিষয়ে সত্যজিৎ ছিলেন, যাকে বলে সিদ্ধপুরুষ। সামান্য দু'-একটি কথায়, একটাও বাড়তি শব্দ না ব্যবহার করে তিনি হাবেভাবে কথায় এমন একটি স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতেন যার থেকে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি শিশুজগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কত গভীর।

দেবী ছবির খোকা ছিল তার কাকিমার অনুরক্ত, আর তার মুখে রাক্ষসের গল্প শোনার ভক্ত। এ জন্য তার কাকিমার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া চাই-ই। একদিন সে মার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে, সময় বুঝে চট্ করে তার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। উঠে পড়ার ভঙ্গিটি এমনই যেন এ বিছানায় শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। বালিশ মাথায় দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে বালকের স্নেহকাতর রূপ। দরজার পাশে লুকিয়ে থেকে আচমকা শব্দ করে কাকিমাকে ভয় দেখায়। কাকিমা বলে 'যদি মরে যেতুম।'

খোকা : তা হলে খুব ভালো হত

দয়া : ও-রে— তা হলে কে গল্প বলত শুনি?

খোকা : মা।

দয়া : তো কাজল পরিয়ে দিত কে?

খোকা : মা।

দৃশ্যটিতে উত্তর দেবার সময় খোকার দুষ্টুমিভরা মুখের অভিব্যক্তি ক্রমশ পালটে যায়, গলার স্বরও হয়ে আসে মৃদু। দয়া যখন বলে 'তা শোও না মার কাছে গিয়ে— এখানে এসেছ কেন?' এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে খোকা? অপ্রস্তুত ভাবকে ঢাকা দেবার জন্য আবদারের ভঙ্গিতে বলে 'গল্প বলো' তখন গলার স্বর বেশ উঁচুতে। আবদারের সঙ্গে মিশে যায় বালকোচিত জেদ।

দেবী ছবির খোকার চোখে পারিপার্শ্বিক অসঙ্গতি সহজেই ধরা পড়ে। তার সবচেয়ে প্রিয় কাকিমা হঠাৎ 'দেবী' হয়ে যাওয়ার পরে সবাই মিলে তার গলায় মালা পরিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করে, ধূপধুনোর অপার্থিব পরিবেশে আড়াল করে রেখে— তার রক্তমাংসের কাকিমাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই কাকিমার ধার ঘেঁষতে সে ভয় পায়, অবাক চোখে তাকে দেখে দূর থেকে। খোকার জীবনের সঙ্গে তার কাকিমার জীবনও জড়িয়ে যায় কোনও অদৃশ্য সূত্রে। গৃহকর্তার জেদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনই কারণ হয়ে ওঠে খোকার মৃত্যুর। এই পরিণামের সঙ্গে কাকিমার জীবনেও নেমে আসে শোচনীয় পরিণতি।

অপুর সংসার-এ একটি দৃশ্যে কাজল বীরেশ্বর মুহুরিকে ভয় দেখায়, বলে 'তোমার মুণ্ডু ভেঙে দেব।' অপু এ ধরনের কথা ছোটবেলায় বলত না। কাজল বলে। তার স্বভাব আচরণ ভাষা সবই গড়ে উঠেছে চারপাশের রুক্ষ অবস্থা থেকে। সেই কাজলই যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'বাবার বুঝি টিকি থাকে', তখন সে সরলতায় একটি নিটোল শিশু হয়ে যায়। 'আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে, বাবা বকবে না, মারবে না'— কথাগুলো নিরাপত্তাহীন শূন্যতার মধ্য থেকে মনের আশঙ্কার প্রকাশ, আশ্বাসের আর্তি। শিশুরা তাদের জীবনের অভাবকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝে না, বোঝে ইন্দ্রিয় দিয়ে, আবেগ দিয়ে। স্নায়ুর চাপ সহ্য করতে শেখেনি বলে শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কথার সাবলীল ভাবে প্রকাশ করে মনের ইচ্ছেকে।

পরশপাথর গল্পে পলটুর কথা ছিল না, ছিল না সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াতেও। এই বালক চরিত্রটি তাঁর সচেতন সংযোজন। কুড়িয়ে পাওয়া সামান্য নুড়ি পাথরটা যে মহামূল্যবান পরশপাথর, সে বার্তা পৌঁছে দেয় এই বালকটি। পলটু জানেও না পরশপাথর কী। ছোটদের কাছে তাদের জমিয়ে-রাখা সম্পত্তির মূল্য বাজারদর দিয়ে ঠিক হয় না। পলটুর কাছে এই পাথরটি শুধু মজার-ই, যা দিয়ে তার খেলনার রং-ও পালটায়। পলটু পরেশবাবুকে পাথরটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় সতর্ক করে দেয় 'এটা (পরশপাথর) কাউকে দিও না কিন্তু'। পলটুর এই সরল সাবধানবাণী, অন্য দিকে ভাগ্য-উপেক্ষিত পরেশবাবুর একটু নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের মধ্যবিত্ত আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য পাথরটিকে যেন-তেন-প্রকারেণ ফিরে পাওয়ার উদ্বেগ— এই দুটি মানসিকতার বৈপরীত্য দৃশ্যকে যেমন কৌতুকরসে সজীব করে তোলে তেমনই শিশুমনের সঙ্গে বয়স্ক মানসিকতার ফারাকটাও বুঝিয়ে দেয়। এই সাবধানবাণীই পরবর্তীকালে পরেশবাবুর জীবনে প্রমাণিত হয় দৈববাণীর মতো।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে পাহাড়ি পরিবেশে লালিত হওয়া প্রাকৃতিক শিশু নেপালি বালকটি সমতলের মানুষদের দেখে সারাক্ষণ ধরে। 'অবাক হয়ে দেখে' কথাটা লিখলাম না, কেননা অবাক হওয়া বা না-হওয়ার পার্থক্যটা সে হয়তো বোঝে না, যা দেখে সেটাই তার জীবনের প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা। তার শিশুমনে অসঙ্গতি ধরা পড়ে সহজেই। সে মনীষা-প্রণবেশের সম্পর্কের ঘনিয়ে ওঠা বেসুরো ভাবটা লক্ষ করেই চলে আসে ঠিক সময়ে পরাজিত ব্যক্তিটির কাছে। অনুভবে স্পষ্ট বোঝে, পরাজয়ের গ্লানিতে প্রণবেশ বিধ্বস্ত। এখন হাতটা বাড়ালেই হল, ঝুলি উজাড় করে দেবে। হিসেবি মন সাধারণ অবস্থায় ততটা উদার হতে পারে না। মনীষার কাছে প্রত্যাখ্যানের পর প্রণবেশের আনা 'উপহার' হয়ে পড়ে অবাঞ্ছিত। যেটিকে যথাসময়ে দেওয়ার মধ্যে থাকত 'বাজিমাত'-এর ঘোষণা। ঘটনাচক্রে সেটিই এল নেপালি

বালকটির হাতে। সে-মুহূর্তের আনন্দকে প্রকাশ করল গানে—

হিরদা হিরদা, তিমরো মন
পিঞ্জরালে ঢাকেছে
মন খোল হাস লা লা

গোটা দার্জিলিং শহর যখন দৃশ্যমান অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যে ভাস্বর, তখন একমাত্র প্রকৃতির শিশুটিই সেখানে অবশিষ্ট থেকে যায়।

এই ছবিতে ছোট মেয়ে টুকলু পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ার পিঠে চেপে। মা-দিদা ওকে সাজিয়ে দিয়েছে লাল টুকটুকে কোট আর জুতো মোজা পরিয়ে। সে ঘুরতে ঘুরতে ডাকে মা-কে। মা তখন গোপন করে রাখা প্রেমপত্র পড়তে ব্যস্ত। টুকলুর ডাকে আড়ালের আবরণটা যেন খুলে যায়, হকচকিয়ে ওঠে সে। মেয়ের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে। টুকলু ডাকে বাবাকে, জুয়া-নেশায় আসক্ত বাবা নিজের জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ব্যস্ত। উদ্বিগ্ন মুখ, অন্যমনস্ক ভাব। টুকলুর ডাকে সে সাড়া দেয় না। বাবা-মার জগৎ ছাড়িয়ে তার আরও আশ্রয় আছে। সে মিষ্টি সুরে ডেকে ওঠে 'দিদা... আমি চারবার ঘুরেছি, আবার ঘুরব' একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে সে ফিরে ফিরে আসে মা-বাবার কাছে। শিশুর সরল বিশ্বাসকে কি তার মা-বাবা ভুল প্রমাণ করবে? মেয়ের কণ্ঠস্বরই যেন তাদের সম্পর্কটাকে পুনর্বিবেচনার সুযোগ এনে দেয়। ভাঙা সম্পর্ককে পুরোপুরি ছিন্ন না করে সচেষ্ট হয় এই শিশুকে অবলম্বন করে বাঁচতে। শিশুকে ঘিরে ভবিষ্যতে যে জীবন গড়ে উঠবে তাতে হয়তো এরা নিজেদের ভুলভ্রান্তিকে কাটিয়ে নতুনভাবে বাঁচতে পারবে।

'গোরা পল্টন আ গিয়া সরকার' ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয় *শতরঞ্চ কে খিলাড়ীর* বালক কাল্লু, পুলকিত বিস্ময়ে। তার কাছে ভাল-মন্দর বিচার নেই, আছে নতুন যুগের বার্তা। পট পরিবর্তনের শিহরন বালকটি অনুভব করে তার শিরায়, শিরায়।

সদগতির ব্রাহ্মণ বালক মতির কাছে ধরা পড়ে, দুখীর প্রতি তার বাবার নির্মম আচরণ। বাবা তার আচরণকে বালকের কাছে আড়াল করে রাখার জন্য ধমক দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে চায়। কৌতূহলী বালকের চোখ সরে না। সে দেখে সব কিছুই। অসুস্থ দুখী কাঠ কাটতে কাটতে ছিটকে পড়ে মৃত্যুর কবলে। এই অমানুষিক ব্যবহারের নিশ্চিত পরিণামের বার্তা ঘোষিত হয় বালক মারফত। জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্য কাঁপিয়ে দেয় বালকের অস্তিত্বকে।

শাখা প্রশাখা ছবিতে ডিঙ্গোই আসে দাদুর কাছে স্বচ্ছন্দে, কথা বলে খোলা মনে। সে জঙ্গলে দেখেছে দুটো গিরগিটি, বাড়িতে শুনেছে দু'রকম টাকার কথা। গিরগিটি

রং পাল্টায়, টাকাও রং পাল্টায়। একই গিরগিটি দু'ভাবে ধরা দেয়, একই টাকা রোজগারের তারতম্যে দু'রকম হয়ে পড়ে। বালকের কাছে এটা একটা মজার খেলা। আর কোনও কোনও মানুষের কাছে এটা হয় মর্মান্তিক বার্তা। এ বাড়িতেও দু'নম্বরী টাকার অস্তিত্ব আছে এ খবরটি বৃদ্ধের কাছে পৌঁছে যায় শিশুর মারফত। নীতিপরায়ণ বৃদ্ধ ও সরল নিষ্পাপ শিশু তখন একই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে।

আগন্তুক ছবির সাত্যকি তার শিশুমনে অনায়াসে বুঝতে পারে নবাগত মানুষটি আসল না নকল। পঁয়ত্রিশ বছর পর মনোমোহনের মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য ভাগ্নীর বাড়িতে আসার পর তাঁকে নিয়ে সকলের যে স্বার্থান্বেষী চিন্তা কাজ করে, তাতে সকলকেই প্রতিষ্ঠিত জীবনের আড়ালে থাকা বৈষয়িক বিষয়ে ক্ষুদ্রমনা অমানুষ করে তোলে। অথচ বালকের স্বচ্ছ মনে এই কুটিলতা স্পর্শ করে না।

মনোমোহনের জীবন কেটেছে মাটির কাছাকাছি, প্রকৃতির মধ্যে, তথাকথিত সভ্যজগতের বাইরে থাকা মানুষের সঙ্গে। তাঁর সহজ জীবনের ধরন শিশুমনকে আকৃষ্ট করে অনায়াসে। ব্যক্তিগত স্বার্থের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়া বয়স্ক মানুষের চাইতে শিশুদের সঙ্গ তিনি উপভোগ করেন বেশি। তাঁর জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা, সৌরজগতের বিস্ময়ের কথা ছোটদের কাছে যখন বলেন, তখন সেই অবাক-হওয়া চোখের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তথাকথিত অসভ্য মানুষের বিস্ময়ে ভরা মনের প্রতিফলন।

সময়ের উজান অনেকটা পেরিয়ে এসে আধুনিক জীবনের ক্ষতবিক্ষত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যজিৎ লেখেন *পিকুর ডায়রি*।

পিকুর বয়স ছ' বছর। সে ডায়রি লেখে। তাতে লেখে সে তার মনের কথা। বা বলা যেতে পারে তার দিন কাটানোর কথা। এক ছোট্ট সংসারে সে থাকে। মা-বাবা-দাদা আর দাদুকে নিয়ে। দাদা প্রায়ই বাড়ি থাকে না। 'পলিটিস' করে, সেজন্য তাকে বাইরে বাইরেই থাকতে হয়। দাদুর 'অসুক'। 'করোনানি থমবোসি'। সে নিজের ঘরে বিছানায়ই বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকে। বাবা থাকে অফিসে। বাবা অফিসে গেলে প্রায় দিনই মা হিতেশকাকুর সঙ্গে বের হয়। হিতেশকাকু এ বাড়ির লোক না। তবে প্রায়ই আসে। টেলিফোনে বাবা হিতেশকাকুর সঙ্গে মার সিনেমায় যাওয়ার কথা শুনলে 'কড়াক' করে ফোনটা রেখে দেয়। পিকু মার এই বেরিয়ে যাওয়াটা পছন্দ না। মা চলে গেলে বাড়িতে একা একাই থাকতে হয়। এই দুঃখটা মা পূরণ করে খেলনা এনে। আজকাল মা খুব জিনিস দেয়, হিতেশকাকুও দেয় অনেক কিছু। সারা দিন বাড়িতে পিকু কী আর করবে? এটা-সেটা করে, কিন্তু কিছুতেই মন লাগে না। এক-একদিন রাতে বাড়িতে পার্টি হয়। পার্টি মানেই চেনা-অচেনা সেন্টের গন্ধ, মদের

বিশ্রী গন্ধ আর বমি করা। কেউ বমি করলে মা বলে— 'অসুক তাই'। অনুকূল বলে 'মদ তাই'। মা পিকুকে জোর করে শুতে পাঠিয়ে দেয়। পিকুর ঘুম আসে না। মাঝে মাঝেই মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া হয়। চেঁচামেচি। একদিন শোনে, মা বাবাকে বলছে যে সে চলে যাবে। মা যদি সত্যি চলে যায়, তা হলে মুশকিল। একদিন যখন বাড়িতে কেউ নেই, শুধু পিকু আর দাদু, তখন পিকু শোনে দাদু ঘণ্টা বাজাচ্ছে টিং টিং টিং টিং। ঘণ্টা বাজানো মানে দাদুর কিছু দরকার। সে দৌড়ে এসে দেখে, দাদু চুপচাপ শুয়ে আছে। কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। চোখ খোলা, উপরের দিকে দেখছে, আর একটা বদমাইশ মাছি খালি খালি আসছে-আসছে আর জ্বালাতন করছে।

ডায়রিতে একটা শিশুমনের তরল ভাব বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। চোখের সামনের দৃশ্যগুলো সামান্য প্রসঙ্গসূত্র ধরে অসংলগ্নভাবে মনের মধ্যে ভেসে ভেসে আসে। একটি কর্মহীন নিঃসঙ্গ বালক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও স্নেহের স্পর্শের অভাবে কোনও কিছুতে মন দিতে পারে না। মা বাবার নির্মম উদাসীনতা আর বাড়ির বিরুদ্ধ-পরিবেশ তাকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে।

আমরা ছোটদের অবুঝ বলে ভাবি, কোনও কিছুই বোঝে না। কিন্তু এরা বড়দের কাজকর্ম সব দেখে। নিজেদের মতো করে একটা ধারণাও করে নেয়। খুব সহজ ভাবে আসে সেই ধারণাটা। পিকুর চোখেও ধরা পড়েছে বড়দের জগৎটা। স্ট্রাইক, বম্ব, পুলিশ, গুলির আওয়াজ, পলিটিকস আর পার্টি, মদ, বড়দের সিনেমা সব ভিড় করে আসে। হিতেশকাকু আর মার সম্পর্কটা এখন হয়তো কোনও অর্থ নিয়ে আসে না, আসে বিরক্তি নিয়ে। এ সব অভিজ্ঞতা তার কাছে সহজভাবে আসে না। আসে তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার জন্য কুটিল পথে। এই জটিল পথ-পেরোনোটা বালকের মনে কখনওই কোনও সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলে না। তার শিশুমনে এ সব ঘটনার ছাপ বড় বয়সে যে কী আকার নেবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

এই গল্পটিকে নিয়ে তৈরি ছবিতে পিকুর আর্তনাদ আরও স্পষ্ট। বাগানের থেকে ঘরে ফিরে এসে যখন দেখে মার শোবার ঘর বন্ধ আর ভেতর থেকে আসছে মার সঙ্গে হিতেশকাকুর ঝগড়ার আওয়াজ, তখন সে আর শিশু থাকে না, সে হয়ে ওঠে অভিভাবক। 'চোপ' বলে সে শুধু বকুনি দেয় না, ধিক্কার জানায়, প্রতিবাদ করে। এ রকম ধমকেই সে সকালে থামিয়েছিল পাশের বাড়ির কুকুরের চিৎকার। একই শব্দের যোগসূত্রে সমান্তরাল দুটি দৃশ্যে মনুষ্যত্ব আর পশুত্ব যেন একাকার হয়ে যায়।

বা, ধরা যাক, *টু* ছবিটির কথা। প্রকৃতির সঙ্গে স্পর্শশূন্য ধনী ঘরের ছেলেটিও সারা দিন এক একা কাটায়, খেলনার সঙ্গে বন্ধ ঘরে। তাদের বাড়িতেও পার্টি হয়। পরের দিন তার ছাপ থাকে সারা ঘরে। মা বেরিয়ে যায়। ছেলেটি কোকাকোলা খায়,

ইংরেজি ছবির 'টাফ গাই'-এর ভঙ্গিতে। রবারের বলে লাথি মারে, দেশলাই জ্বালিয়ে বেলুন ফাটায়। বাড়ি খেলনায় ভরতি। শেলফে, ডিভানে, মেঝেতে এলোমেলোভাবে ছড়ানো। দম-দেওয়া খেলনাগুলো সচল অথচ নিষ্প্রাণ। এদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। বললেও, উত্তর মেলে না। কমিউনিকেট করা যায় না। দম বন্ধ করা পরিবেশ। এমনই সময়ে সে শোনে বাঁশির সুর। দৌড়ে আসে জানালার কাছে। দেখে, ওরই বয়সি একটি ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। কুঁড়েঘরের পাশে অপরিচ্ছন্ন পোশাকে ছেলেটি বাঁশি বাজায় প্রাণের আনন্দে। ধনী ঘরের ছেলেটি দৌড়ে খেলনা ক্ল্যারিয়নেট নিয়ে এসে বাজাতে শুরু করে। খেলনা ক্ল্যারিয়নেটের কর্কশ আওয়াজ বাঁশির মিষ্টি সুরকে ঢেকে দেয়। গরিব ছেলেটি তখন ঢোল বাজাতে শুরু করে। ধনী ছেলেটি নিয়ে আসে দম দেওয়া ড্রাম। ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে, খেলাচ্ছলে, আনন্দে। ধনী ছেলেটি তার পর একে একে জাহির করে তার হরেক রকম দামি দামি খেলনা। গরিব ছেলেটির আছে একটাই মুখোশ, আর একটা বর্শা। সে এত রকমারি খেলনা দেখে মুষড়ে পড়ে। জেতার আনন্দে ধনী ছেলেটি ঘরে ফেরে। হঠাৎ সে দেখে আকাশে একটা ঘুড়ি। গরিব ছেলেটি ওড়াচ্ছে। ধনী ছেলেটির ঘুড়ি নেই, সে গুলতি দিয়ে সেটাকে তাক করে, দু'চারবার ছুঁড়েও লাগাতে পারে না। পরে নিয়ে আসে একটা এয়ার-গান। সেটাকে ছুঁড়ে ঘুড়িটাকে ফুটো করে দেয়। মনের দুঃখে গরিব ছেলেটি ঘরে ফেরে। বিজয়গর্বে ধনী ছেলেটি ঘরে এসে রোবটে দম দেয়। দম দেওয়া রোবোটটি চলতে চলতে সাজানো খেলনায় ধাক্কা মারে, সাজানো পিরামিড ভেঙে পড়ে। বাড়ি ফিরে গরিব ছেলেটি মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। বাঁশির প্রাকৃতিক সুর ধনী ছেলেটিকে হতোদ্যম করে।

এই ছবির বালক দুটি পিকুর সমবয়সি হলেও, ঘটনাগুলো ভিন্ন। এদের দৃষ্টিতে বড়দের জগৎটা প্রত্যক্ষভাবে আসে না। তবে বাড়ির লোকজনের উদাসীনতা বালকমনে যে নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে বা নিজেদের উদাসীনতাকে ঢেকে রাখার জন্য খেলনা দিয়ে ঘর সাজিয়ে যে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে, তাতে শিশুমনে এক ধরনের বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়। সেটা স্বাভাবিক জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। নির্জন ঘরে বন্দি হয়ে ভালো-না-লাগা, মন-না-বসার অবস্থা। এতে যে বিরক্তি ভাব আসে তাতে মন চলে যায় ভাঙচুরের দিকে। অন্য দিকে গরিব শিশুটির হাব-ভাব, অভিব্যক্তিতে আছে প্রাণোচ্ছল আনন্দ। দারিদ্র্য তার মনে কোনও অভাববোধের সৃষ্টি করে না। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আহা বেচারা' ভাবটা শিশুদের মধ্যে আসে না। তাদের মেলামেশার জগতে কোনও রাজা-উজির নেই, সামান্য বস্তুও তাদের কাছে মহামূল্যবান সামগ্রী। মাটির কাছাকাছি

থাকা ছবির গরিব শিশুটি ঘুড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় কষ্ট পায়, কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছেলেটি আনন্দের উপকরণ পায় বাঁশি বাজিয়ে। এই বাঁশির সুর ঘরে বন্দি ছেলেটির মনের জ্বলুনি আর অস্থিরতাকে দেয় উস্‌কে। দুঃসহ করে তোলে তার বাড়ির কৃত্রিম পরিবেশ, নিঃসঙ্গ সময় ও স্নেহশূন্য সম্পর্ককে।

পিকু বা *টু* ছবির ঘরে বন্দি বড়লোক বাড়ির ছেলেটি যদিও একা একাই সময় কাটায়, তাদের বাড়ির পরিবেশ সদানন্দের মতো একটি নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নেওয়ার জন্য. একেবারেই অনুকূল নয়। *সদানন্দের খুদে জগৎ*টা একেবারে তার নিজের তৈরি। সেখানে বড়দের প্রবেশ নিষেধ। পিকুদের জগতে বড়দের অপরাধ বারবার এসে হানা দেয়। সেখানে সব কিছু থেকেও তার যেন কোনও কিছুই নেই। সদানন্দের দেখার জগৎ মমতা ও অনুভূতিতে মেশা। তার জানালায় বসা কাকের হাবভাব দেখে মনে হয় যেন সার্কাসের সং। পিকুও চড়াই পাখি দেখে, সেটাকে ভাল করে নজর করে না, সে চায় এয়ারগান দিয়ে পাখিটাকে মারতে। পালিয়ে গেলে ভাবে বদমাইশ পাখি। বাড়ির নিঃসঙ্গ জীবনে তৈরি হয় দূরত্ব, আলগা হয়ে যায় স্নেহ-মমতার বন্ধন, মনের মধ্যে বাড়ে উদ্বেগ আর অসহায়বোধ, যার প্রতিফলন ঘটে তার ব্যবহারিক অস্থিরতা ও আক্রোশের মধ্যে। সদানন্দের পিঁপড়ের জগৎটাকে মনে হয় মানুষেরই মতো। তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনা, খাটুনি, উদ্ভাবনী শক্তি সব কিছুই সদানন্দের নজরে পড়ে। ভাবে, এরাও কি লেখাপড়া শেখে, অঙ্ক কষে, ছবি আঁকে, কারিগরি শেখে! এরা মরে গেলে সে মানুষের মরে যাওয়ার মতোই দুঃখ পায়। যারা এদের ভালবাসে না, মেরে ফেলে, সে কারণেই হোক বা অকারণে, তাদের ওপর খুব রাগ হয় সদানন্দের। একজন গোমড়ামুখো বয়স্ক ডাক্তার পিঁপড়ের কামড় খেয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে যখন তিন-চার রকম বাংলা ইংরেজি মেশানো বিশ্রী শব্দ করেন, তখন সদানন্দের হাসি আর থামানো যায় না।

কাশীর ঘোষালবাড়ির ছেলে রুকুও থাকে তার নিজের জগতে। যত রাজ্যের ডিটেকটিভ বই পড়ে তার মনটাও রোমাঞ্চে ভরা। দাদু আর নাতি মিলে সারা দিন নানা রকম ফন্দি আঁটে। তেতলায় তার একটা নিজস্ব ঘর আছে। সেটাই তার সাম্রাজ্য। নানা রকম রোমাঞ্চকর কল্পনায় সে দুশমনদের মারে, অপরাধীদের ধরে, দুষ্টু লোককে সাজা দেয় (*জয় বাবা ফেলুনাথ*)।

নিজেকে নিয়ে সময় কাটানো একটা অভ্যেস। ছোটদের মনে কল্পনাশক্তি উস্‌কে দিতে পারলেই এ অভ্যাসটা তৈরি হয়ে যায় আপনাআপনি। ছোট্ট মানিকও এই অল্প বয়সে গড়পারের বাড়ির তেতলায় ঠাকুরদাদার খালি পড়ে থাকা কাজের ঘরে সময় কাটাতে ভালবাসত। সেখানে ছিল একটা কাঠের বাক্স, আর তাতে ছিল লিনসিড

তেলের শিশি, ছবি আঁকার তুলি, রং, আরও টুকিটাকি জিনিস। এ সব ছিল তার কাছে আরব্যোপন্যাসের দ্রব্যসামগ্রীর মতো। ভবানীপুরের বাড়িতে যখন ঘরের দরজা-জানালা থাকত বন্ধ, তখন খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় রাস্তার উল্টো ছবি পড়ত জানালায় ও পাশের দেওয়ালে। বন্ধ ঘরে আবছা আলোয় গাড়ি, রিকশা, সাইকেল, লোকজন দেখতে দেখতে মানিক চলে যেত এক ম্যাজিকের জগতে।

নিজের কল্পনায় ডুবে থেকে মনে মনে কত সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়, কত দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ানো যায়, সে সব কথা *অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু* গল্পের টিপু জানে। রূপকথার বই পড়ে টিপুর মনটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন উড়ে চলে যেত। যে নিজেই হয়ে যেত রাজপুত্তুর— তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি আর কোমরে হিরে বসানো তলোয়ার। কোনও দিন সে যেত গজমোতির হার আনতে, কোনও দিন ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

নিশ্চিন্দিপুরের বালক অপুরও এভাবে মন চলে যেত চোখের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে কোনও এক অসম্ভবের দেশে, অজানা রাজ্যে। হরিহর-সর্বজয়ার সংসারে দারিদ্র্যের ঝলসানি থাকলেও অপু-দুর্গার কাছে ছিল উন্মুক্ত প্রকৃতির অকৃপণ দান। শিশুমনের অবাধ বিকাশের সুযোগ, কল্পনার আকাশে মনকে ছড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ। জীবন সেখানে শুরু হয় জীবনেরই টানে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার ভার নেয় অভিভাবকেরা। শিশুদের কাছে থাকে বিস্ময়-মাখা কল্পনার জগৎ। দারিদ্র্যের দহন শিশুমনকে স্পর্শ করে না। অপু-দুর্গা আপন খেয়ালে কাশবনের মধ্যে হারিয়ে যায়, টেলিগ্রাফের তারের খুঁটিতে ভেসে আসা অচেনা আওয়াজে মন চলে যায় অচিন কোনও দেশে, চলমান ট্রেনের ধাতব শব্দে বিস্ময়ে অপু শিহরিত হয়।

সম্বলহীন হরিহর জীবিকার তাগিদে এসে পৌঁছয় বারাণসীতে। সেই শহরের ঘাটের অলৌকিক গঠন বালক অপুর চোখে ফিরিয়ে আনে আশৈশবলালিত বিস্ময়ের বোধ। প্রকৃতির কোলে সে মেলে ধরে নিজেকে— ঘাটে, গলিতে, মন্দিরে, খোলা প্রান্তরে। এই বিস্ময়বোধ থেকেই জন্ম নেয় সুদূরের প্রতি টান, চেনা বিশ্বের বাইরের অচেনা জগৎকে দেখার আকুতি। সব বিপর্যয়কে কাটিয়ে অপরাজিত হওয়ার দুর্মর তাগিদ। সত্যজিতের সৃষ্টিতে এভাবেই যেন মিশে যায় তাঁর নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায় ছবির চরিত্রের জীবনের গতিপথ। কূপমণ্ডূকতার গণ্ডিকে ভেঙে কৌতূহল আর খোঁজের টানে বহমান জীবনের নানা প্রান্তে ছুটে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা। তাঁর জীবনের শেষ ছবি *আগন্তুক*-এর মনোমোহন এই পরামর্শই দিয়েছিল বালক সাত্যকিকে।